"উৎসব-বিকাশের মধ্যে সেই পরিপূর্ণ আনন্দকে উপভোগ করিবার জন্য এই মধুর প্রভাতে আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াছি। বৎসরে একদিনই উৎসব হয়, সংগ্রহ এক সময়েই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার ভোগ সমস্ত বৎসর ধরিয়া। জন্ম একদিনই হয় কিন্তু তাহার সাধনা সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া। জীবন-পথ দীর্ঘ, এই দীর্ঘ জীবন পথে আমরা কি পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া বিচরণ করিব? কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় স্থিতি, কোথায় যাইতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ কোথায়? তাহার নির্দ্দেশ আদর্শে। সে আদর্শ কি, না পরিপূর্ণ আনন্দ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।" আনন্দময় পরমপুরুষ হইতে জীব সকল জন্মগ্রহণ করে, আনন্দেই স্থিতি এবং আনন্দেই অভিগমন করে। পুষ্প যে উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়া তত্রাগত লোকচক্ষুকে আনন্দ বিতরণ করে, তাহা অপূর্ণ আনন্দ, নিবিড় রজনীতে আকাশে বিকসিত হইয়া নক্ষত্ররাজি যখন পৃথিবীর মানবকে আলিঙ্গন দিয়া প্রফুল্লিত করে, তাহা অপূর্ণ আনন্দ, অনন্ত আকাশে সমুদ্ভাসিত হইয়া উজ্জ্বল করপ্রভাবে সূর্য্য যখন প্রাণদানে সৌর প্রাণীপুঞ্জকে সঞ্জীবিত করে, তাহাও অপূর্ণ আনন্দ—তাহা আনন্দকণা। বিশ্বমহিমার সকল বৈচিত্র্য হইতেই আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু তাহা সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই কণা মাত্র। কোন ব্যষ্টিতে সে আনন্দের পূর্ণতা নাই, কোন সমষ্টিতে সে আনন্দের পূর্ণতা নাই। পূর্ণ আনন্দ যদি চাও তবে এই ব্যষ্টির মধ্যে যিনি পূর্ণ, সমষ্টির মধ্যে যিনি পূর্ণ এবং এই সমস্ত ব্যষ্টি সমষ্টির অতীত হইয়াও যিনি অন্তর্যামী রূপে থাকিয়া তাহাদিগকে আনন্দ বিধান করিতেছেন, সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছেন, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর—সেই অমৃত পুরুষকে জ্ঞাননেত্রে দেখিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও। তিনিই আমাদিগের আদর্শ। তাঁহাকে কেবল আনন্দরূপ বলিলেই তাঁহার সকল ভাব বলা হয় না। তিনি আনন্দরূপ, তিনি মঙ্গলরূপ, তিনি শান্তিরূপ। সকল বৈচিত্র্য যেখানে এক হইয়া যায়, সকল ভেদ যেখানে ভগ্ন হয়, সকল সৌন্দর্য্য যেখানে একই শোভা ধারণ করে, সকল মঙ্গল যেখানে পর্য্যবসিত হয়, সকল শান্তিই যেখানে অনন্ত গাম্ভীর্য্য লাভ করে, সেই একই এই উৎসবের উৎসাহ দাতা পরিপূর্ণ আনন্দ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা যেখানে তপস্যা করিতেন, তাঁহাদের সেই তপোবনের অন্তর্বাহ্য ভেদ করিয়া যে এক তৃপ্তিকর আনন্দধারা উৎসারিত হইত তাহাকে তো অরণ্যবিহারী সমীরণ বা কুসুমজ্যোৎস্না প্রসূত বলিতে পারিব না। তাহা সেই তপস্বীর তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্যোতিরই ধারা, যাহাতে কানন প্রস্ফুটিত হইয়া শান্তিবায়ু প্রবাহিত করিত, আনন্দপ্রস্রবণ নিঃসারিত করিত। তাহাই তপস্বীর গৃহদ্বারকে নির্ব্বিঘ্ন করিত। হিংসা, ভয়, ব্যাধি সে তপোবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত না, আর সেই তপঃপরায়ণ মহর্ষি নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে পরিপূর্ণ আনন্দময়ে চিত্ত সমাধান করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ঋষিপত্নী আরণ্য ফলে অতিথি সৎকার করিতেন নির্ভয়ে, নির্ভয়ে ঋষিপুত্র বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিত। হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র দুরন্ত স্বভাব পরিহার করিয়া কোন্ গভীর তৃপ্তিতে আত্মহারা হইয়া সংযত ভাবে আশ্রমদ্বারে পড়িয়া থাকিত। আনন্দই তাহার মূল, যে আনন্দ

গভীর ধ্যানরত মহাপুরুষের আত্মা হইতে বহির্গত হইত। সেই আনন্দই আজ আমরা ভোগ করিব, এই উৎসব প্রভাতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৎসর এবং সমস্ত জীবন। তাহাই আমাদের গৃহের শ্রী হইবে, হৃদয়ের পবিত্রতা হইবে, এবং ভোগের অন্ন হইবে। আমাদের সঞ্চয়ের বস্তু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং এবং শান্তং শিবমদ্বৈতং। যে পরম মঙ্গলালয় ব্রহ্ম আমাদের আত্মার আত্মারূপে বিরাজমান, জ্ঞানে তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতিদ্বারা তাঁহার পূজা করিব এবং তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পথে বিচরণ করিব, ইহাই আমাদের ব্রত। এই ব্রত উদযাপন করিতে পারিলে, গৃহ তপোবন হয়, প্রবৃত্তি শান্ত হয়, প্রীতি প্রস্ফুটিত হয়, শত্রু মিত্র হয়, এবং আনন্দ কল্যাণে সংসার শান্তির আগার হয়। অনন্ত-জ্ঞান পরমেশ্বর আমাদের সকল অজ্ঞান কলুষ বিনষ্ট করিতে অন্তরে অন্তরে দীপ্যমান রহিয়াছেন, এই পূজা-মন্দির পূর্ণ করিয়া পবিত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ংই আমাদের অনন্ত জীবন পথের নেতা ও আদর্শ। তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে দর্শন করিয়া এই প্রভাতের উৎসব-সময়ে এস ভাই, সকলে মিলে প্রীতি-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু যে সারগর্ভ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করেন তাই এই

"প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়—প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে—এমন সময় প্রত্যূষে প্রভাত এসে পূর্ব্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে যাদুকরের মত জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়—দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্ত্তা এই মুহূর্ত্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্চে না প্রভাত এই কথাই বল্‌চে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আন্‌তে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে, কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড় বড় সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে,—এ সেই অতি পুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্ত্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল,—সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণা-

বাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মত এসে দাঁড়িয়েছে! এ একেবারে নবীনতার মূর্ত্তি—সদ্যোজাত শিশুর মতই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনি নবীন হয়ে ওঠে—এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এনেছে।

এর মানে কি? এর মানে হচ্চে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী—পুরাতনতা, জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মত আস্‌চে যাচ্চে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্চে—এ'কে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা, তারা মরীচিকার মত—জ্যোতির্ম্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা—কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতি পুরাতন দিন, এ'কে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আস্‌তে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুল্‌তে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্ম্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তারপরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধূলার পর ধূলা আবর্জ্জনার পর আবর্জ্জনা কেবলি জমে উঠ্‌ত—চেষ্টার ক্ষোভে, অহঙ্কারের তাপে, কর্ম্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলি মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলি কাড়তে যাওয়া, কেবলি ধাক্কা খাওয়া, কেবলি অন্তহীন পথ, কেবলি লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মত বিদীর্ণ করে ফেল্‌ত।

এখনো দিনের বিচিত্র সঙ্গীত তার সমস্ত মূর্চ্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠেনি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্ম্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠ্‌তে চাইবে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মত এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেসুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেম্‌নি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই,—সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর—নিত্য রাগিণীর মূর্ত্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এম্‌নি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুন্‌তে পাই যে কোলাহল যতই বিষম হোক্‌না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিষটা হচ্চে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেই জন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্ত্তিতে

একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইচে কিন্তু রোজ সকাল বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্চেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্ম্মল মূর্ত্তিকে দেখ্‌তে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলি রেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলট্ পালট্ হয়ে যাক্‌না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে—কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না—তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়—তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতে আসেনা। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্ত্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুন্‌তে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়—চরম হচ্চেন অদ্বৈতম্। আমরা চোকের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্ন বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্র টলেনি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্ অন্তরে অদ্বৈতম্।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুন্‌তে পেয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্ম্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্ম্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্চে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তিনি সৃষ্টি করচেন, নিখিল জগৎ এই মাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলি একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্চে এ কথা ঠিক নয়;—জগৎকে কেউ বহন করচে না, জগৎকে কেবলি সৃষ্টি করা হচ্চে—যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্চে—সেই প্রথমের সংস্রব কোনো মতে ঘুচ্‌চে না—এই জন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্ব্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমাদের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হতে হবে—আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছয়—প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে

নূতন করে স্বীকার করে এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে, আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না—আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে—সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনো মতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনি প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ বিভাগ ভেদ বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পার্ব্বে এত বড় শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে! কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি—সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্ব্বলতা। এই জন্যেই অহঙ্কারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগ সাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা আসে কোথা থেকে এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্রগুলি কেমন? না গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্য্যন্ত যাক্ না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না; সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা—কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্চেন;—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে—কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্ত্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিষ কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই;—তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারম্বার পরিস্ফুট করে তুল্‌তে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মত আমাদের

স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্চে সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলা-রূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যতদূরই যাক্ না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে—কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘট্‌বে—তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে:—

> অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না সমস্তের মূলে যিনি আছেন, তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকে নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই জন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভাল করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁৎ করে, সমস্ত তার গুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূলগানটি উপযুক্ত মত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিন্‌তে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুল্‌তে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটি প্রভাতের মত সরল, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন,—ভোগবিলাস ঐশ্বর্য্য উপকরণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমে কত কাজকর্ম্ম, অর্জ্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়—এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না—আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ স্বরটিতে পৌঁছন, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বল্‌চেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দ-সমুদ্রে কেবলি তরঙ্গলীলা চলচে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্ম্মের বেগে সে যতদূর পর্য্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটাই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ সমুদ্রেই তার লীলা চল্‌চে—তার পরে কর্ম্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দ সমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্চে যথার্থ জীবন—এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল—সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও! প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড় হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য্য হয়ে উঠ্‌ব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি তবু বলচি এ পথ তোমার না হোক্! তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক্ যেখানে জগতের ছোট বড় সকলেই এসে মিলেছে; তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জ্জন করে তাকে সার্থক কর—যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাক্‌বে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে এই তোমার সাধনা হোক্। ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আস্‌বে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না, এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই রকম ঘট্‌চে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আন আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না,

তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে, আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না—তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বার বার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম্ম সংসারের খেলা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্বে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়;—সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখ যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্য্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে;—দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আস—তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে, অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে—আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে—একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখ্তে দেখ্তে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে—বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে—ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস—জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্বে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখ—তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে—সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠ্বে। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্চে—এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও—বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্ম্মকে নির্ম্মলরূপে সত্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধূলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জান্তে, দান বলে গ্রহণ করতে; এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরাণো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সঙ্কীর্ণ হয়ে আসচে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেন না, এযে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মত ভাস্চে; নীলাকাশের নির্ম্মল ললাটে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নায়

দানসাগর ব্রত পালন করচে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা আপনি ভরে উঠ্‌ছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুম্‌কিও খসে নি; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌চে, বল দেখি আমি তোমার জন্যে কি এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মত নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলচে, চির-নবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবল ফুটে ফুটে উঠ্‌চে। মৃত্যু কেবলি আপ-নাকেই আপনি ধ্বংস করচে—সে যা-কিছুকে সরাচ্চে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেল্‌চে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনি তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ কর, জরা-জীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাক্; চির-নবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখ—শৈশবের সত্য দৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক্, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মত করে একবার দেখ, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ কর। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখ—কত বড় একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কি নিবিড়, কি নিগূঢ়, কি আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগ-তের সমস্ত সঙ্গীতে বেজে উঠ্‌চে, সেই মিল-নেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে! এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন! এই সৌন্দর্য্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই—চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন—চির-সুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা—সংসারের সমস্ত পর্দ্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহঙ্কারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চির-দিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর—সত্য হোক্ তোমার জীবন, তোমার জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় হোক্, অমৃতময় হোক্!

দেখ, আজ দেখ, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই—কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলি কেটে কেটে যাচ্চে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মত আবৃত আবদ্ধ করতে পারচে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্ত মহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকে-দিগন্তে দীপ জ্বল্‌চে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে—আজ তোমার কিসের সঙ্কোচ—আজ তুমি নিজেকে জান—সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠ, পুলকিত হয়ে ওঠ—তোমারি আত্মার এই মহোৎসব সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মত এক ধারে পড়ে থেকোনা—যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মত উঞ্ছবৃত্তি কোরো না!

হে অন্তরতর, আমাকে বড় করে জানা-বার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে

ঘুচিয়ে দাও—তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও! আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য; আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্ম্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও! আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধূলায় নত করে দাও যে ধূলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্ব্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনই যেতে দেবেনা—ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আস্‌তেই হবে, বারম্বার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে! দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধূলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়—অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হাল্কা হয়, ধূলার চিহ্ন থাকে না,—একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতে গিয়ে পৌঁছতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও—তখন কোনো ব্যবধান রাখনা,—তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও—নির্ম্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি,—মনে গর্ব্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি; কিন্তু প্রেমের টান ত ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব্ব নিয়ে ত আত্মার ক্ষুধা মেটে না—শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্ব্বলতা—তখন গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই—তখনি তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না—সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক্, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্ম্মের ঝঙ্কারে,—বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক্, শান্তের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক্—পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক্—সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, জীবন মৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক্, অন্তর বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক্, ভূর্ভুবস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ, বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

পরে এই কয়েকটি সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

ভৈরোঁ—তেওরা।

আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে
আঁধার মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা,
আনন্দে হাসিতে ভরা

যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো।
তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত বুলালো বুলালো।

টোড়ী-ভৈরবী—দাদ্‌রা।

নিশার স্বপন ছুটলরে এই ছুটলরে।
টুট্‌ল বাঁধন টুট্‌লরে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগত পানে,
হৃদয় শতদলের সকল দলগুলি
এই ফুটলরে এই ফুটলরে।
দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে,
নয়ন জলে ভেসে হৃদয় চরণতলে লুট্‌লরে।
আকাশ হতে প্রভাত আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো;
ভাঙা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠ্‌লরে এই উঠ্‌লরে।

টোড়ী—ঝম্পক।

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন!
আবার চোখে নামে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আবার নানাদিকে ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে উঠে ক্রমে,
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।
তব নীরব বাণী হৃদয় তলে,
ডুবে না যেন লোকের কোলাহলে;
সবার মাঝে আমার সাথে থাক,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাক,
নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখ
আলোকে ভরা উদার ত্রিভুবন॥

মিশ্র বিভাস—ঠুংরী।

এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ।
প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে
মুখে আমার চোখ থুয়েছে
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ॥

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তেওরা।

জয় তব বিচিত্র আনন্দ,
হে কবি, জয় তোমার করুণা
জয় তব ভীষণ সব কলুষ নাশন রুদ্রতা,
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা।
জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির নিবিড় নিশীথিনী,
জয় দায়িনী, জয় প্রেম মধুময় মিলন তব,
জয় অসহ বিচ্ছেদ বেদনা॥

জৌনপুরী টোড়ী—একতালা।

কে সে পরম সুন্দর যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ
অনন্ত অম্বর।
আনন্দ-ঝঙ্কারে যাঁর মনের বিচিত্র তার
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বাজে নিরন্তর।
সে সঙ্গীত ছলে লীন মনোবীণা স্পন্দহীন,
তিলেক বিচ্ছেদে তাঁর ব্যাকুল অন্তর।
রূপ তাঁর সর্ব্বস্থানে, রস তাঁর ঘরে প্রাণে,
প্রেম তাঁর কোলে টানে বিশ্বচরাচর॥

ঝংলা—তেওরা।

প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে!
আনন্দ গান গারে হৃদয়, আনন্দ গান গারে।
নীল আকাশের নীরব কথা,

শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক্ আজি তোমার
বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে,
যোগ দেরে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা'রে!

ইহার মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত মহর্ষিদেবের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাকী গান করিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করেন।

—

রাত্রিকাল।

উপাসনা আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হইয়া মহর্ষিদেবের বাটীর সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। উপরে নীচে বিন্দুমাত্র স্থান অবশিষ্ট রহিল না। লোক সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র হইবে। ঠিক ৬টার সময় সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় এই ভাবে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"এই উৎসব রজনীতে ব্রহ্মোপাসনার উদ্বোধন বচনে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে এবং সংশয়-তিমির তিরোহিত করিতে ইচ্ছা করি। যেন আমাদিগের চিত্ত উৎসবের বাহ্য-সম্পদে মোহিত না হইয়া ইহার মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ইহার সত্য-সৌন্দর্য্যে সমাহিত হয়। সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্ত শরীরের অবসাদ এখনো বিদূরিত হয় নাই, এখনো কামনার আকর্ষণ হইতে চক্ষুশ্রোত্রের লোলুপ দৃষ্টি প্রত্যক্‌মুখী হয় নাই, কিন্তু সান্ধ্যগগণে প্রকৃতির দিগন্তব্যাপী উলুরব বরণডালা হস্তে করিয়া প্রকৃতির নিয়ন্তা দেশাতীত—কালাতীত মহেশ্বরের আরতি করিতে উত্থিত হইয়াছে —এখনি আমাদের বিবেককে জাগ্রত করিতে হইবে।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি
তদ্যথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা
শয়িতৈবমেবেদং শেতে।
অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব।"

যখন হৃদ্গত সমস্ত কামনা দূরীভূত হয় তখন এই মরণশীল জীব অমর হয় এবং এই স্থানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যেমন সর্পের ত্বক সর্পাশ্রয় বল্মীকে অনাত্মভাবে পতিত থাকে, সেইরূপ দেহমুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই শরীরও নিশ্চেষ্টভাবে শয়ন করিয়া থাকে। এই প্রাণ অর্থাৎ আত্মা অশরীর ও অমৃত। ইনি অতি বৃহৎ এবং তেজ মাত্রই। এই কথা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য জনককে পুনরায় বলিলেন—রাজন্! আত্মকাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যে মোক্ষলাভ করেন তদ্বিষয়ে অপর মন্ত্রও উক্ত হইয়াছে শ্রবণ করুণ—

অণুঃপন্থা বিততঃ পুরাণো মাংস্পৃষ্টোঽনুবিত্তো
ময়ৈব তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং
লোকমিত উর্দ্ধং বিমুক্তাঃ।"

এই মোক্ষপথ সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতীব দুর্বিজ্ঞেয় বিধায় অণু অথচ ইহা বিস্তীর্ণ ও পুরাণ। ইহা আমাকে স্পর্শ করিয়াছে অর্থাৎ আমি এই পথ লাভ করিয়াছি। এবং মৎকর্ত্তৃক ইহা অনুবিত্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমি এই পথের ফল যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহাও লাভ করিয়াছি। এই ব্রহ্মবিদ্যামার্গ দ্বারা অপর ধীর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সকলও এই জীবদ্দশাতেই বিমুক্ত হইয়া দেহপাতের পর

স্বর্গলোক অর্থাৎ মুক্তিধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"এষঃ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি
ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ।"

এই ব্রহ্মপথ নিষ্কাম ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত পুরুষই লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ ও তৈজস পুরুষই এ পথে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

এই মহাবাক্য জাগ্রত যাজ্ঞবল্ক্যের মুখোচ্চারিত সত্যবাণী। যদি আমাদের নিজের নিজের জ্ঞান-চক্ষু এখনো উন্মেষিত না হইয়া থাকে, যদি আমাদের নিজের নিজের বিবেক এখনো জাগ্রত না হইয়া থাকে, তবে এস ভাই আমরা এই উপনিষদ্ বাক্যে, এই আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা হৃদয়ের অতি রমনীয় সম্পদ, শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রসূতি, জ্ঞানই মুক্তির সোপান, মুক্তিই জীবের লক্ষ্য। যাঁহার লক্ষ্য মুক্তি, ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার তপস্যা। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই তপস্যাই অরণ্য হইতে গৃহে আনিয়া গৃহকে পবিত্র করিয়াছেন, সমাজকে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মপিপাসুর প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মোৎসব আনন্দকুসুমকে বিকসিত করিয়া দেয়, ব্রহ্মোৎসব ঈশ্বরের মহিমাকে জাগ্রত করিয়া দেয়। যাঁহার মহিমা বসন্তের গন্ধবহ অনীল-সঞ্চারে প্রকাশিত হয়, যাঁহার মহিমা মেঘ বিদ্যুৎ বজ্ররবে, যাঁহার মহিমা চির-তুষারাবৃত হিমাদ্রি-শিখরে এবং যাঁহার মহিমা অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জে, এই উৎসব রজনীতে তাঁহারই অব্যক্ত অনন্ত মহিমা আমাদের হৃদয় মনকে অনন্ত অসীম আনন্দে নিমজ্জিত করিতে চাহিতেছে এবং তাহারই মধ্য হইতে যে মধুময় নিঃশব্দ অমৃতবাণী অমৃতে যাইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, আমরা যেন সে আহ্বানে বধিরকর্ণ না হই। এমন শুভদিন, এমন পুণ্য মুহূর্ত্ত আমরা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হই না। অতএব হে অমৃতের প্রিয়পুত্র সকল, হে জাগ্রত জীবন্ত মনুষ্য সকল, এস ভাই, এই পুণ্যমুহূর্ত্তে সেই মহা মহিমান্বিত অমৃত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া এবং তাঁহাতেই আমাদের অন্তর্বাহ্য সকলই বিসর্জ্জন দিয়া জীবনকে মধুময় করি"।

উপাসনান্তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার ওজস্বিনী ভাষায় যে গবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলে স্তব্ধ হইয়া যান। এই যে বিপুল জনতা, তাহার মধ্যে যে শান্তভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলে যে বিমল তৃপ্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্থানাভাবে রবীন্দ্র বাবুর হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না, আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

পরে কয়েকটি নূতন সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরাগ—তেওরা।

কার্ মিলন চাও বিরহী!
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ—
ভব অরণ্যে কুটিল জটিল গহনে,
শান্তি সুখ হীন ওরে মন!
দেখ দেখরে চিত্ত কমলে
চরণ পদ্ম রাজে হায়
অমৃত জ্যোতি কিবা সুন্দর, ওরে মন!

ভীমপলশ্রী—সুরফাঁক্তা।

দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
আনন্দ সভা ভবনে আজ।
বিপুল মহিমাময় গগনে মহাসনে
বিরাজ করে বিশ্বরাজ।

সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধর মালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে
গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্ব মহোৎসব দেখি
মগন হল সুখে কবি
চিত্ত ভুলি গেল সব কাজ ॥

মিশ্র ইমন—তেওরা।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে ॥

মিশ্র কেদারা—কাওয়ালি।

জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে,
ভাসালে আমারে জগতের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে,
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।
কত বার তুমি মেঘের আড়ালে,
অমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে,
কত কালে কালে কত লোকে লোকে,
কত নব নব আলোকে আলোকে,
অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে,
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে,
কত দুখে সুখে, কত প্রেমে গানে,
অমৃতের কত রস বরষণ ॥

শ্যাম—একতালা।

নয়ান ভাসিল জলে! শূন্য হিয়া তলে
ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদ পবনে
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপ হরণ তৃষিত শরণ জয় তাঁর দয়া গাওরে
জাগরে আনন্দে চিত চাতক জাগো
মৃদু মৃদু মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে ॥

কাফি-সিন্ধু—একতালা।

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি
যেন সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দুহাত ভরে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি
যেন সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি ঘরে যতই বাজে বাঁশী,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

বাহার-বাগেশ্রী—তেওরা।

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে।

কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণ ধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।
ওগো পথিক আজকে আমার
সকল পরাণ ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ
বাতাস আসে হে মহারাজ
তোমার গন্ধ মেখে॥

দেশ—তেওরা।

জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত,
চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড়নন্দিত প্রেম-কম্পিত
হৃদয়-কুঞ্জ-বিতানে।
মুক্ত বন্ধন সপ্ত স্বর তব করুক বিশ্ব বিহার,
সূর্য্য-শশি-নক্ষত্রলোকে করুক হর্ষ প্রচার,
তানে তানে প্রাণেপ্রাণে গাঁথ নন্দন হার,
পূর্ণ কররে গগন অঙ্গন তাঁর বন্দন গানে॥

বেহাগ—ধামার।

জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে
জাগরে অন্তর জাগো।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধ প্রাণে
নিমেষ হারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা
নীরব গীত রসে হ'ল হারা;
জাগে বসুন্ধরা অম্বর জাগেরে
জাগেরে সুন্দর সাথে॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে,
চরণতলে কোটি শশি সূর্য্য মরে লাজে।
গর্ব্ব সব টুটিয়া মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে।
একি পুলক বেদনা বহিছে মধুবায়ে,
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে, হেরিনা কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

যা হারিয়ে যায়, তাই আগ্‌লে বসে
রইব কত আর!
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে হে নাথ
ভাবতে অনিবার।
আছি রাত্রিদিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে,
আস্‌তে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারম্বার।
তাই ত কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখতে যা চাই রয় না তাও
ধূলায় একাকার।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।

চির দিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি ॥

কীর্ত্তনের সুর—ঠুংরী।

ঐ আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধূলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো
চির জনম এমন করে ভুলিও নাক,
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব ;
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।
আমি তোমার যাত্রিদলের রব পিছে,
স্থান দিওহে আমায় তুমি সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না ত রইব চেয়ে।
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হব ॥

এক।

এক কারে কয়
যে একের যোগ কভু ছিন্ন নাহি হয়।
যে চেতনা পরশিলে মর্ম্মগ্রন্থি যায় খুলে
বিচিত্র রচনা মাঝে যোগের উদয়
এক তারে কয়।
পাইবারে যেই যোগ প্রকাশিত এই লোক
মর্ম্মের আনন্দ যেথা একই সুরে বয়
এক তারে কয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

সাথে সাথে থাক তুমি নিখিল নির্ভর
দিবসের আলো নিভে যায়,
চারিদিকে অন্ধকার হয় গাঢ়তর
থাক তুমি ঘিরিয়া আমায়।
দীনবন্ধু তুমি বিনে কে দেখিবে আর,
কে দিবে তাপিতে শান্তি, সুধা সান্ত্বনায়।

মানব জীবন ক্ষুদ্র ছদিনে ফুরায়
ক্ষুদ্র ঢেউ নদীতে যেমন,
পৃথিবীর খেলা ধুলা ধূলিতে মিশায়,
হর্ষ জ্যোতি বিষাদে মগন।
আজ যাহা আছে কাল শুষ্ক ধূলি সার
হে অনন্ত থাক নিত্য হৃদয়ে আমার।

চাহিনা যারেক দৃষ্টি, সান্ত্বনার বাণী,
থাক সদা হৃদয় আসনে,
ভক্তের হৃদয়ে যথা দিবস যামিনী
থাকিতে তেমনি সর্ব্বক্ষণে।
চির পরিচিত প্রিয় অসীম মহান
নহে ক্ষণ তরে, এসো পূর্ণ কর প্রাণ।

এসোনা দেখাতে ভয় হে রাজা আমার,
এস মোর জুড়াও হৃদয়,
তোমার শান্তির স্পর্শ সুধা সান্ত্বনায়
জুড়াইবে ক্ষত সমুদয়।
হও মোর দুঃখে দুঃখী, দোষ ক্ষমা করি,
পতিত পাবন এসো পতিতে উদ্ধারি।

আমি চাই সর্ব্বকাজে সকল সময়ে
তুমি জাগ হৃদয় কমলে,
পাপ প্রলোভন আসে ছলিতে হৃদয়ে
তাহে যেন হৃদয় না টলে,
তুমি হও ধ্রুবতারা পথ দেখাইয়া,
আলো ও আঁধারে থাক, জুড়াও এ হিয়া।

নাহি শত্রু হেন কেহ যারে করি ভয়
তুমি যদি কর আশীর্ব্বাদ,
দুঃখেতে কাতর নই, অশ্রু ব্যথা ময়
নহে যদি থাক সাথে সাথ।
মরণে নাহিক ভয়, আর কারে ভয়,
হইব বিজয়ী লয়ে ও নাম অভয়।

নিশি দিন জেগে থাক নয়নে আমার
স্বপনে বা ঘুমে জাগরণে,
ঢালো জ্যোতি আলো করি ঘন অন্ধকার
লও টানি উর্দ্ধে ও গগনে।
ধরনীর কালো ছায়া, স্বর্গ সুপ্রভাতে
যাবে দূরে যদি তুমি থাক সাথে সাথে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা কথা।

মহর্ষিদেবের শ্রাদ্ধ-বাসর। বিগত ৬ইমাঘ বুধবায় বৈকালে মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য তিন ব্রাহ্মসমাজ হইতেই বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহর্ষিদেবের আদর্শজীবনের গুণাবলী ও তাঁহার বিশেষত্ব কীর্ত্তন করিলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সুদীর্ঘ ও চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব পাঠ করেন। ভবিষ্যতে তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এতদুপলক্ষে যে দুইটি নূতন সঙ্গীত রচিত ও গীত হইয়াছিল তাহা এই—

পূরবী—একতালা।

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার
আজ লব তাঁর দেখা।
সারাদিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে।
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয়নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি'
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজালোক করে রচনা
আমিও সেথায় ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা॥

বাউলের সুর—কাহারবা।

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
ওগো সাধক, ওগো পথিক, ওগো
প্রেমিক, তুমি ধরায় আস।
এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে
বীণা ঝঙ্কারে,
ঘোর বিপদ মাঝে
তুমি কোন্ জননীর মুখের হাসি
দেখিয়া হাস।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে উদাস হয়ে
বেড়াও কে জানে।
এমন, ব্যাকুল কোরে
ওগো, কে তোমারে কাঁদায় যারে
ভালবাস॥

সমালোচনা।

গীতলিপি। এই বৎসরের মাঘোৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহা উৎসবে গীত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশের স্বরলিপি আদি-ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ব্রাহ্মসাধারণের নিকট মূল্যবান সম্পত্তি। প্রাপ্তিস্থান আদি-ব্রাহ্মসমাজ, মূল্য ।৵০ মাত্র।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ১০৲
শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দোপাধ্যায় ২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ বক্সী ৫৲

মাঘোৎসবে দান।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী ২৲
শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত ২৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত ২৲

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

অশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালীন বক্তৃতা।

"প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করচে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্য্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভাল বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়; তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্চে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বল্‌তে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র শাসনকে নিযুক্ত করচে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি। বাহিরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত; সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই

যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন!

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন্, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন্, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্চে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গে যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা এইটে-কেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জ্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড় তা নয়—মানুষের মহত্ত্ব হচ্চে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে; মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই—মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বল্‌তে পেরেছেন যে ছোট হোক্ বড় হোক, উচ্চ হোক নীচ হোক্ শত্রু হোক্ মিত্র হোক্ সকলেই আমার আপন।

মানুষের যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্ব্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগ স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড় হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা!

খৃষ্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচীর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তি-লাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্চে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষ ভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব্ব হয়—সেই গর্ব্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলি বাড়িয়ে নিয়ে চল্‌তে চেষ্টা হয়,—এর আর সীমা নেই—আরো বড়, আরো বড়, আরো বেশি, আরো বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চল্‌তে থাকে, তার সর্ব্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলি স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গল্‌তে পারে না, সে আপনার বড়ত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্ত স্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটো-বড় সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড় কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষ ভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন—ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবিচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই ত আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নিও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই—ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মত পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করচে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়—নমোনমঃ—তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার—সর্ব্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা কিছু উর্দ্ধে আছে অধোতে আছে দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে; যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলচ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্য্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্য্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্চে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কি?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্ব্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব করচেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্চে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে, সমস্ত জগৎকে সর্ব্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে

আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য্য পৃথিবীকে টানচে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্ব্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ—যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ।

তাহলেই দেখা যাচ্চে যদি সেই সর্ব্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্চে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘট্‌চে। তার কাব্য-দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলচে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড় হয়ে উঠ্‌চে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্য্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্য্যন্তই সে সত্য, সেই পর্য্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্ব্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চ্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্ব্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড় পাওয়ার মূল্য কি। আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই—আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সঙ্কেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ কর, ভোগ কর—মা গৃধঃ, লোভ কোরো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনা বর্জ্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বল্‌চে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে লোক আপনাকেই বড় করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয় ত নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকে সত্যতম বলে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর

সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহঙ্কার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে—তখনই সে বড় হতে সুরু করে। কিন্তু সেই বড় হবার মূল্যটি কি? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে, অহঙ্কারকে খর্ব্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না;—গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কি সাধনাই না করতে হয়। তার যে সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড় করে' পরকে আঘাত করে তাকে কেবলি খর্ব্ব কর্ত্তে হয়—তার যে সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চ্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুল্‌তে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড় হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়—ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়ে—একেই ত বলে বীতরাগ হওয়া! এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড় করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্চে মনুষ্যত্বের চেষ্টা।—আমরা আজ দেখ্‌তে পাচ্চি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্চে, বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করচে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্চে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্ম্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্ম্মের চর্চ্চা করা—অন্নজল নদী পর্ব্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্ম্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড় তার চৈতন্যও তত বড় হওয়া চাই, এই জন্যই গৃহীর ভোগে এবং যো-

গীর ত্যাগে সর্ব্বত্রই এমনতর সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মত স্পষ্ট বলেই'ত জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই এই অনন্তকে সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করেনি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারি সাধনা প্রচার করিবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি—

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোট করে মিথ্যা করে তুল্‌তে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড় রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে;—জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোট বড় আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তাহা কে গণনা করবে—এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেননি।—তাঁকে হারানো মানেই হচ্চে মঙ্গলকে হারানো শক্তিকে হারাণ সামঞ্জস্যকে হারাণ এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলি বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্ব্বত্র ছড়াতে পায়না—

সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না—দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলি পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত টলমল করতে থাকে; তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে; তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে—যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করচে—ছুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলচে এবং মানব ঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্ম্মাণ করচে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোট হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলি তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুক্‌রো করে দেওয়া, কেবলি ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই! যে মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্চে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্চেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্চে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, নচেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—ইঁহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইঁহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জান্‌তে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য—প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্ব্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই, যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এই জন্য সকল দেশেই সর্ব্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করচে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজ্‌চে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্চে, কেননা সেই একই অমৃত—সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্ত্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করচে কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা

প্রশস্ত করে নিয়েছে, সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে এখনো তারা ব্যাপ্ত হচ্চে, তাদের শক্তি এখনো কোথাও তেমন করে অভিহত হয়নি—তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই জন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কি? তারা মনে করচে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম—এর পরে বুঝি আর কিছু নেই—যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট্ দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করচে—আজকালকার দিনে উন্নতি বল্‌তে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে—এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্ব্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী এই জন্যে তিনিই হচ্চেন সর্ব্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্ব্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক্ থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে—আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলি আঘাত পেতে থাক্‌ব,—কেবলি অপমান কেবলি ব্যর্থতা ঘট্‌তে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌বে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে যিনি "সর্ব্বগতঃ শিবঃ," যিনি সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্ব্বানুভূঃ।" তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখ্‌লে আমাদের উন্নতি হবেনা তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল—যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠ্‌বে না, তাহলে আমি বল্‌ব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বল্‌তে হবে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন

কুর্য্যাম্। প্রবলরা দুর্ব্বল বলে অবজ্ঞা করবে ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বল্‌তে হবে, যে-নাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ যিনি এক, অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই,—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্ব্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্ম্মল চেতনার মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়—মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্চে—মনে হয় যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুল্‌বে। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতার মূর্ত্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখ্‌তে পাননি—মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি—এইজন্যে অমৃতকে যেন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন। যস্যছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ—এই জন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুঃপ্রাণ স্তক্মা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্তু আয়তে, নমো অস্তু পরায়তে—যে প্রাণ আস্‌চ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্চ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আস্‌বে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রেই তুমি—যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্চে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্চে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি সেই জন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন—প্রাণো বিরাট্—সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্য্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ ক্রন্দন করচ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জ্জন করচ সেই তোমাকে নমস্কার—নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিদ্যুতে জ্বলে উঠ্‌চ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়চ সেই তোমাকে

নমস্কার—প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতর অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন—তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবন-ধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাক্‌তেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে—সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে হে সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দ তোমাকে সর্ব্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক্—যাক্ সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক্—দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক—সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক্, শত্রুমিত্র মিলে যাক্, স্বদেশ বিদেশ এক হোক্। হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই—তোমার অমৃতময় অনুভূতির দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক্ তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্য্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা ত কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেননি। কোন্ প্রেমের সুগন্ধ বসন্ত বাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্ত্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি—বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেই জন্যই জগৎজুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম,—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে ঋতুতে ঋতুতে, অন্নেজলে, ফুলেফলে, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে, বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্ব্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখ্‌লে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে, বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও—দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও, চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারো চেয়ে কিছুমাত্র বড় হতে; তোমার যে রস হাট-বাজারে কেনবার নয়—রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্য্যে আপনাকে আর ধরে রাখ্‌তে পারচে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্চে—তোমার যে রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্চে না ফুরিয়ে যাচ্চে না—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায়-মাতায়, স্বামীস্ত্রীতে, পুত্রেকন্যায়, বন্ধু-বান্ধবে নানা দিকে নানা শাখায় বয়েযাচ্চে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টি-রূপ যে অমৃত তারি একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও

—তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরল করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি—যারা তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরীব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুসি হয়ে যে জায়গাটিতে কারো লোভ নেই সেই খানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি! হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা—আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বল্‌তে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

মানুষের সংহারকার্য্য।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে দিন উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী হইয়া অল্পবুদ্ধি প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে দিন হইতে যে কেবল দুর্ব্বল জীবের সহিতই মানুষের বৈর চলিতেছে, তাহা নয়। প্রকৃতির সহিতও মানুষের এক নীরব সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে কোটি কোটি নিরীহ জীব প্রাণদান করিয়াছে। তা'ছাড়া পৃথিবীর নানা অংশের বনভূমিগুলি তৃণহীন শুষ্কমরুতে পরিণত হইয়া এবং নির্ম্মলসলিলা নদীগুলি কলুষিত ও পঙ্কিল হইয়া প্রকৃতির স্নেহভরা পবিত্র শ্যামলকান্তিকে ক্রমেই কর্কশ করিয়া তুলিতেছে।

পরিবর্ত্তন লইয়াই প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। ধরাবক্ষে যখন মানুষ স্থান পায় নাই তখনইহা চলিত এবং এখনো চলিতেছে। এ সবই সত্য! সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান আপনা হইতেই উচু নীচু হইয়া দেশের ঋতুর পরিবর্ত্তন করিতেছে। পশু পক্ষী লতা গুল্ম পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে গিয়া নিজেদের দেহের কতই পরিবর্ত্তন করিতেছে, হয় তো তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া অপর কোনও সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। এ সবগুলিও সত্য! কিন্তু প্রকৃতির স্বেচ্ছাকৃত এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তনে কোন অমঙ্গল লক্ষণ দেখা যায় না। মানুষ নিজের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির পটে যে তুলিকাপাত করে, তাহাই সেই শান্ত ছবিকে ক্রমে কর্কশ করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর যে অমঙ্গল হইবে তাহার ফল অতি ভয়ানক।

প্রকৃতির অকল্যাণ আনয়ন ব্যাপারে, একমাত্র আধুনিক সভ্যজাতিই দায়ী নয়। মানুষ যখন অসভ্য ছিল তখন হইতেই নিরীহ প্রাণীদিগের হত্যা আরম্ভ করিয়া প্রাণীজগতের এত ক্ষতি করিয়া আসিতেছে যে তাহার আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই পাপের ফলেই এখন ধরাপৃষ্ঠে সুস্থকায় স্বচ্ছন্দচর প্রাণী দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক প্রাণিজাতির বংশলোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। এখন মৃৎপ্রোথিত কঙ্কালে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অনেক বন্য পশুকে বুদ্ধিবলে পোষ মানাইয়া আমরা এখন তাহাদিগকে গার্হস্থ্য সম্পদ করিয়া তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থায় তাহারা এত হীনবীর্য্য এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে যে,

নিজের কীর্ত্তির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই যথেচ্ছাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সম্ভবতঃ কয়েকটি খাদ্যপ্রদ উদ্ভিদ্ এবং আর কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় প্রাণী ছাড়া ক্রমে অন্য সকলই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং শেষে সে গুলিরও পর্য্যন্ত বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে আধিপত্যবিস্তারের জন্য মানুষ আসৃষ্টি এত লালায়িত, উদ্ভিদ্‌হীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থায় তাহার পূর্ণতা হইবে বটে, কিন্তু সে অবস্থা কখনই মানুষের জীবনরক্ষার অনুকূল হইবে না।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টা স্ফুটতর হইবে। অসভ্য মানুষ অনৈতিহাসিক যুগে আধুনিক যুগের মানুষদিগের ন্যায় বন্দুক কামান ব্যবহার করিতে পারিত না সত্য, তথাপি তাহারা শিলাময় অস্ত্রশস্ত্রাদির আঘাতে ম্যামথ্ নামক হস্তিজাতীয় জীবের বংশনাশের যে সহায়তা করে নাই এ কথা কোনক্রমেই বলা যায় না। ম্যামথ্ আর ধরাপৃষ্ঠ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গভীর ভূস্তরে প্রোথিত কঙ্কাল দ্বারাই এখন তাহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অতি প্রাচীন কালে আমেরিকার সর্ব্বাংশে নানা জাতীয় বন্য অশ্ব দলে দলে আনন্দে বিচরণ করিত। আজকাল তাহাদের একটিও ভূপৃষ্ঠে নাই। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের তিরোভাবকেও মানুষের কীর্ত্তি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি চালাইয়া এই জীবগুলির বংশলোপ করে নাই সত্য, কিন্তু যে সকল সংক্রামক এবং সাংঘাতিক ব্যাধিদ্বারা তাহারা নির্ব্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। যখন আমেরিকার বনভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন য়ুরোপ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে বৈদেশিকগণ পীড়ার বীজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে আনিয়া বন্য অশ্বগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল।

আমরা যে দুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথা বলিলাম, তাহাকে কেবল মানুষেরই কীর্ত্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না। প্রাকৃতিক অবস্থার যে সকল পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই চলিতেছে তাহার ফলে অনেক জীবের বংশলোপ ঘটিয়াছে এবং অনেক নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে এই প্রকার ঘটনার শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়। ম্যামথ্ এবং বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ ঐ প্রকার প্রাকৃতিক উৎপাতেরই ফল বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে বাইসন্ নামক মহিষজাতীয় জন্তুর যে তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। বাইসন্ এবং য়ুরোপের বন্য গো-জাতির উচ্ছেদের জন্য এক মানুষই দায়ী। আবাস-ভূমিগুলিকে অরণ্যবর্জ্জিত করিয়া মানুষই তাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছিল, এবং সেই মানুষই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের বংশলোপ ঘটাইয়াছে। নেক্‌ড়ে বাঘ (Wolf) এবং বিভার জাতীয় প্রাণীগুলিও ঐ প্রকার অত্যাচারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুইডেন্, নরওয়ে, রুসিয়া এবং ফ্রান্স হইতেও ইহারা ক্রমে তাড়িত হইতেছে। আর কয়েক শত বৎসর পরে পৃথিবীর কোন অংশেই ঐ দুই প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আমরা এখন কঙ্কাল দেখিয়া যেমন ম্যামথের অস্তিত্ব জানিতেছি, তখন

বিভারের অস্তিত্ব কেবল তাহাদের মৃৎ-প্রোথিত কঙ্কাল দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে।

অতি প্রাচীন কালে ভল্লুক পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই দেখা যাইত। মানুষের অত্যাচারেই তাহাদিগকে ইংলণ্ড ছাড়িতে হইয়াছে। সিংহ য়ুরোপের আর কোন অংশেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাসিডোনিয়া এবং এসিয়া মাইনরে যে প্রচুর সিংহ ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। জিরাফ্ এবং হস্তীও ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। এই সকল প্রাণীর উচ্ছেদ কার্য্যের জন্য এক মানুষই দায়ী। গরিলা এবং সিম্পাঞ্জি নামক দুই জাতীয় বনমানুষের নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্ত্তক ডারুইন্ সাহেব মানুষকে ইহাদেরি বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আজকাল এ গুলিকেও আর অধিক দেখা যায় না। মানুষের সহিত একটু আধটু দূরসাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া আজকাল অনেকে ধরিয়া বাঁধিয়া উহাদিগকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শত শত বন-মানুষ এই খেয়ালে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। এ প্রকার অত্যাচার আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে, বোধ হয় ধরাপৃষ্ঠে আর ইহাদিগকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পক্ষী এবং পতঙ্গ জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি মানুষের নৃশংসতা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিখ্যাত (Dodo) পক্ষী এখন এক প্রকার পুঁথিগত জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা'ছাড়া আধুনিক সুসভ্য মানুষের বিলাসের উপকরণ জোগাইবার জন্য যে কত পক্ষীর বংশলোপ হইতে বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। অষ্ট্রিচ্ এবং ময়ূরের সুদৃশ্য পক্ষই তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয় তো দুই তিন শত বৎসরের পর পৃথিবীতে উহাদের কোন চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। প্রজাপতি বা অপর পতঙ্গগুলি দীর্ঘজীবী নয়। দুই তিন দিন মাত্র পক্ষ বিস্তার করিয়া ইহারা আনন্দে বিচরণ করে এবং তার পরই জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংসারে কাহারো সহিত তাহাদের বৈরিতা নাই, এবং তাহারা কাহারো অনিষ্টও করে না। সুসভ্য মানুষের খরদৃষ্টি ইহাদেরও উপরে পড়িয়াছে। সুন্দর পক্ষ দুটিকে কাটিয়া রাখিবার জন্য সভ্য মানুষ জাল হাতে করিয়া দলে দলে প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিতেছে। এই অত্যাচারে কয়েকজাতীয় সুদৃশ্য প্রজাপতির বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বড় বড় নদনদী এবং জলাশয় গুলির জল দূষিত করিয়া মানুষ নানা জলচর প্রাণীর যে সংহার-কার্য্য নীরবে চালাইতেছে, তাহা আরো ভয়ানক। জলাশয়ের জলকে নির্ম্মল রাখার কার্য্যে জলচর প্রাণী কম সহায় নয়। আমাদের কলকারখানার আবর্জ্জনা ও ড্রেণের দূষিত পদার্থযোগে নদীজল এত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে যে, পরম হিতকর জলচর প্রাণিগণও আর জলে থাকিতে পারিতেছে না। ক্রমেই তাহারা নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে পূর্ণ। টেমস্ নদীতে আর সামন্ (Salmon) মৎস্য পাওয়া যায় না, এবং আমাদের ভাগীরথী ও পদ্মা মৎস্যহীন হইয়া আসিতেছে। খুব সম্ভবতঃ আর কয়েক শত বৎসর পরে সভ্য দেশে শ্যামলতটশালিনী স্বচ্ছতোয়া নদী দুর্লভ হইবে। কৃমি ও জীবাণুপূর্ণ কলুষবাহী নদী নগর-বক্ষ দিয়া বহিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে এই

বীভৎস দৃশ্য দেখিতেই হইবে। আধুনিক
বিজ্ঞানকে ইহার জন্য দায়ী করিলে
চলিবে না। মানুষের অর্থপিপাসা এবং
বিলাসপরায়ণতাকেই তখন ধিক্কার দিতে
হইবে। প্রজাপতি ও ময়ূরের সুদৃশ্য-
পক্ষযুগল এবং হস্তীর তুষার শুভ্র কঠিন
দন্তযুগ্ম মানুষের ঘর সাজাইবার উপ-
করণপ্রস্তরের জন্যই যে ভগবান্ নির্ম্মাণ
করেন নাই, এই সহজ কথাটা আধু-
নিক বৈজ্ঞানিকযুগের মানুষ যে কেন
ভুলিয়া যায়, তাহা জানি না। এই সকল
পাপের দণ্ড মানুষকে এক দিন গ্রহণ করি-
তেই হইবে। যে বজ্রের আঘাত মানব-
জাতি মাথা পাতিয়া লইয়া পাপের প্রায়-
শ্চিত্ত করিবে, তাহা প্রকৃতির কর্ম্মশালায়
প্রস্তুত হইতেছে।

প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদ্‌দিগের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মানুষের সংহার
কার্য্যের ধারাবাহিকতা সেখানেও দেখা
যায়। গাছ কাটিয়া বন পোড়াইয়া মানুষ
জগতের এবং নিজের যে অনিষ্ট করিতেছে
তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। ভূপৃষ্ঠ নি-
জেই সচ্ছিদ্র। উদ্ভিদ্‌দিগের গভীর এবং
সুদূর বিস্তৃত মূল মৃত্তিকাকে জমাট বাঁধিতে
না দিয়া সচ্ছিদ্রতা আরো বাড়াইয়া তোলে।
বর্ষার জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে শিকড়-
সংলগ্ন মৃত্তিকা স্পঞ্জের ন্যায় সেই জল
ধরিয়া রাখে। তা'র পর যখন গ্রীষ্মের
প্রচণ্ড সূর্য্য-তাপে ভূ-পৃষ্ঠ ও জলাশয়গুলি
শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই
অরণ্য তলের সঞ্চিত জলরাশি মাটির ভিতর
দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া জলাশয়-
গুলিকে পূর্ণ করিতে থাকে। অরণ্যের
এই জলসঞ্চয় কাজটি বড় কম ব্যাপার
নয়। বড় বড় জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলি-
লেই যে দেশে জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা
দেয়, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার
অনেক প্রমাণ আছে। ডার্টমুর হইতে
খাল কাটিয়া ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ্ সহরে
জল যোগাইবার ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া
চলিয়া আসিতেছিল। ঐ অঞ্চলে যে দুই
একটি বড় জঙ্গল ছিল তাহা কাটিয়া ফে-
লায়, এখন খাল প্রায় শুষ্ক হইয়া আসি-
য়াছে। সকল দেশেই অরণ্য ধ্বংসের
এই প্রকার প্রত্যক্ষ কুফল হাতে হাতে
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বৃক্ষ সকল
তাহাদের মূলের দ্বারা কেবল জল আট্-
কাইয়াই যে দেশের হিতসাধন করে তাহা
নয়; স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষাব্যাপারেও ইহা-
দের অনেক কাজ আছে। খুব শুষ্ক এবং
খুব ভিজা বায়ুর মধ্যে কোনটিই স্বাস্থ্যের
অনুকূল্ নয়। এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়
বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত থাকিলে, কেবল তা-
হাই আমাদের হিতকর হয়। উদ্ভিদ্-দেহ
হইতে অবিরাম যে জলীয় বাষ্প বহির্গত
হয়, তাহাই শুষ্কতানিবারণ করিয়া বায়ুকে
প্রাণীর স্বাস্থ্য-প্রদ করিয়া তোলে। অরণ্যের
ধ্বংসসাধন করিয়া স্পেন্ যে কুকার্য্য করি-
য়াছিল, এখন দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায়
তাহার প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। মার্কিনেরাও
ধীরে ধীরে অরণ্য-উচ্ছেদের কুফল বুঝিতে
আরম্ভ করিয়াছেন। চীন এবং তিব্বতের
সীমান্তপ্রদেশ কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে
উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দেশ অরণ্য-
হীন করায় এখন তাহা প্রাণি-চিহ্ন-বর্জ্জিত
মহা প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল বৃহৎ
মরুভূমি আছে, তাহাদের উৎপত্তির জন্য
মানুষকে অবশ্যই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায়
না। কিন্তু কতকগুলি স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র
মরুভূমি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া
শ্যামল উর্ব্বর ভূখণ্ডকে গ্রাস করিতে আরম্ভ

করিয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। প্রাণিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখা দিলে, তাহা যেমন ক্রমেই বিস্তার লাভ করিয়া সুস্থ অংশই জুড়িয়া বসে, ক্ষুদ্র মরুভূমি গুলি সেই প্রকার ক্ষতের ন্যায়ই বিস্তার লাভ করিয়া পার্শ্বস্থ উর্ব্বর ভূভাগকে কুক্ষিগত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মরুভূমির এই প্রকার ক্রমবিস্তার ভূপৃষ্ঠের ব্যাধি-বিশেষ, সুতরাং ইহার নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুভূমির উৎপাদন করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। এইগুলি যখন কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভূভাগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন মানুষ নিজের কুকার্য্যের ফল আরো প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।

রসো বৈ সঃ।

এ জগত রসেতে মগন।
রসেতে ডুবিয়ে রসেরে লভিয়ে
করিতেছে সবে জীবন ধারণ।
এ জগত রসেতে মগন।

না হইলে এই রসের সঞ্চার
শুকাইত প্রাণ লুপ্ত এ সংসার
সব শূন্যাকার হত একাকার
থাকিত না কেহ জড় কি চেতন।
এ জগত রসেতে মগন।

বিচিত্র রূপেতে হইয়ে প্রকাশ
করিছে এ রস সবারে বিকাশ
অন্তরে বাহিরে নানা রূপ ধরে
তুলিছে সবারে করি সচেতন।
এ জগত রসেতে মগন।

সর্ব্ব রসাধার অন্তরে ইহার
রসময় হয়ে করেন বিহার
হেরিলে তাঁহারে মোহ যায় দূরে
আনন্দ সাগরে ভাসে ত্রিভুবন
এ জগত রসেতে মগন।

আপনাতে এঁরে হেরেছেন যিনি
অচেতন কভু নাহি হন তিনি
অন্তরেতে তাঁর হয় অনিবার
যোগেতে সবার মরম স্পন্দন।
এ জগত রসেতে মগন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

প্রতি দিন শুষ্ক কণ্ঠে করি নাম গান
কই দেব এখনোও জুড়ায় না প্রাণ।
এখনত মেটেনাক প্রাণের পিপাসা,
কবে দয়াময় তুমি পুরাইবে আশা?
কবে বর্ষাধারা সম হৃদয়ে আমার
ঝরিবে মঙ্গল ধারা বল অনিবার?
কবে প্রাণ ভরে আমি ডাকিয়া তোমারে,
পাব তৃপ্তি, পাব সুখ, বল এ অন্তরে?
ডাকি ক্ষণ তরে তাহে আশা যে মেটেনা
সর্ব্বদা প্রাণের সাধে ডাকিতে বাসনা।
মিটাও বাসনা মম প্রভু দয়াময়
তুমি ইচ্ছা করিলেই সব পূর্ণ হয়।
পাব কণ্ঠে শক্তি নব, করি নাম গান
অতুল আনন্দে পূর্ণ হবে মন প্রাণ।

প্রার্থনা।

প্রকৃতির সনে বাঁধা হৃদয় আমার,
সুনীল গগন মেঘে ঢাকা অন্ধকার।
নাহি তারা নাহি শশী, তেমনি হৃদয়
নিরাশার তীব্র ঘাতে পূর্ণ সমুদয়।
কিন্তু গগনের মেঘ মুহূর্ত্তে মিলায়,
নির্ম্মল আকাশে পুনঃ শশী শোভা পায়।
জাগে তারকার জ্যোতি, হৃদয় আমার
তেমনি করিয়া আলো নাশি অন্ধকার,
এস তুমি পূর্ণ শশী, জ্যোতি প্রকাশিয়া
নাশি দৈন্য, দুঃখ, তাপ জুড়াইয়া হিয়া।
পৃথিবীর মোহজাল করি দাও দূর,
এসো আলো কর মম হৃদি অন্তঃপুর।
সরল শিশুর মত তোমার চরণে
লভিয়া আশ্রয় শান্ত হয় দীন জনে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানা কথা।

নিষ্কাম-ভাব। লোকের মনে যখন অন্ধভক্তি প্রবল হয়, তখন তাহারা তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অপেক্ষা তীর্থকেই বড় মনে করে। মহাত্মা আবুবেকার একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি একদিন একটি প্রজ্বলিত মশাল গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি মক্কায় গিয়া মক্কার মসজিদ পোড়াইয়া ফেলিব, তাহা হইলে ভক্তেরা মসজিদের পরিবর্ত্তে মসজিদের প্রভুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবে। আর এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে আমি স্বর্গ ও নরক নষ্ট করিয়া ফেলিতাম; স্বর্গের লোভে ও নরকের ভয়ে মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করে। ইহা বড়ই অন্যায়। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনাই কর্ত্তব্য। সুপ্রভাত, মাঘ সংখ্যা।

সেবাধর্ম্ম। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আতুরাশ্রমের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটের ১২৫নং বাটীতে সুসম্পন্ন হয়। সে দিন সেখানে আমরা যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। দীন দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু বৃদ্ধ বধির সহস্রাধিক ঐ খানে প্রাতঃকাল হইতে সমাগত হয়। স্বেচ্ছা-সেবকেরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে তৈল মর্দ্দনান্তে স্নান করায় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করায়। যাহারা অন্ধ তাহাদিগকে হাত-ধরিয়া বসায়, যাহারা চলৎশক্তি রহিত তাহাদিগকে কেদারায় বসাইয়া লইয়া চলে। স্বেচ্ছা-সেবকদিগের মধ্যে ক্লান্তি নাই, বিরক্তির ভাব নাই, হিন্দু মুসলমান ও অন্য জাতীয় ভিক্ষুক বলিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, সকলকেই সমানভাবে তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা যেন সকলেই উদ্‌গ্রীব। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য বঙ্গের ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ছোট লাটের গলায় পুষ্পমাল্য দিবার উদ্যোগ হইল ছোটলাট সে মালা নিজে না লইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া অভ্যাগত আতুরের গলায় নিজহস্তে সাদরে পরাইয়া দিলেন। শুনিলাম ঠিক এই সময়ে মাল্য-প্রদানোদ্যত ছোটলাটের ও আতুরের একখানি ফোটো লওয়া হইয়াছে। যে বিরাট প্রাণের উদ্যোগে এই আতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও তাহার এই লোভনীয় পরিণতি, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস। হাইকোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত ষ্টিফেন সাহেব ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং অনেকগুলি পদস্থ ইংরাজ এই সাধুকর্ম্মের বিশেষ সহায়। স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে কয়েকটি মুসলমান ছিলেন; বক্রী হিন্দু; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। তাঁহারা এই সাধু কার্য্যে যোগ দিবার জন্য বেহালা বড়িশা পরুই ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সহরতলী হইতে আসিবার জন্য এক ভাড়ায় ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়েতে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল।

উৎসব।—হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী একদিন উপাসনার কার্য্য করেন। কলিকাতা জানবাজারস্থিত হরিসেনা-মণ্ডলীর উৎসবেও তিনি গমন করিয়াছিলেন।

আচার্য্য।—ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত তিন বৎসর ধরিয়া প্রায় নিয়মিত ভাবে প্রতি বুধবার আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বেদী হইতে যে সকল মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন তাহার অধিকাংশই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তিনি রাঁচিতে নিবাস-নিকেতন ও উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় সেইখানে ক্ষেপণ করিবার বাসনা রাখেন। বিগত ১১ই ফাল্গুন তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিয়া উপদেশান্তে উপাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রকাশ্য ভাবে কিছু দিনের জন্য বিদায় চাহিতে গিয়া নিজে চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই, সমবেত উপাসকগণও অশ্রুজল বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার উদার ও অমায়িক ব্যবহারে সকলের প্রীতি ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐ দিনকার তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ, আমরা যত দূর পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছি, আগামী সংখ্যায় বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র বুধবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষদিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায়, সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সপ্তদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮১।

৮০১ সংখ্যা ১৮৩২ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে আচার্য্যের উপদেশ।

বন্ধুগণ! আমরা অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি। ব্রহ্মের উপাসনা আমাদের ব্রত। আমরা অদ্য এই সমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনায় সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমার বিদায়ের দিন, এই অবসরে আপনাদিগকে দু চার কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, দুই দণ্ডকাল মন্ত্রোচ্চারণেই কি আমাদের উপাসনার সার্থকতা হয়? আমাদের লক্ষ্য কি? চরম উদ্দেশ্য কি একবার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম-প্রাপ্তি, ব্রহ্মকে লাভ করা। ইহা শুধু আমাদের নহে—সকল ধর্ম্মেরই সাধারণ উদ্দেশ্য। উপায় ভিন্ন হইতে পারে—লক্ষ্য আসলে এক। শত পথ আছে কিন্তু গম্যস্থান একই। ব্রহ্মকে পাওয়া যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তা'হলে তাহা সিদ্ধির নিমিত্তে প্রথম প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞান। যাঁকে পেতে চাই তাঁকে সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। সেই সত্যস্বরূপকে জ্ঞানদ্বারা জানিতে হইবে। এই ব্রহ্মজ্ঞান কিসে লাভ করা যায়, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় অনেকস্থলে সে জ্ঞানাগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত, তাহা উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত করাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন দুই সূত্রে এই ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করি।

এক বিশ্ব-প্রকৃতি, আর এক বিজ্ঞানাত্মা। বিজ্ঞান-বীক্ষণে আমরা জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা আশ্চর্য্য কৌশলের ভূরি ভূরি নিদর্শন দর্শন করি এবং তাহা হইতে সেই বিশ্বনিয়ন্তার জ্ঞান ও শক্তি উপলব্ধি করি। আমাদের জ্ঞান যত প্রস্ফুটিত হয় আমরা সেই পরিমাণে দেখিতে পাই যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক পরমাশ্চর্য্য যোগসূত্রে গ্রথিত, এক উপাদানে গঠিত, এক অখণ্ডনীয় নিয়মে নিয়মিত। দেখি যে এই অসীম বৈচিত্রের মূলে একতা বিরাজ করিতেছে। ক্রমে আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যে যাঁহার জ্ঞান ও শক্তি সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে—

তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং।" মানব সমাজের শৈশবস্থায় মানুষ বহুরূপী প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া বহু দেবতার কল্পনা করিয়া পূজা করে। বৈদিক কালের আভাস আমরা বেদের মধ্যে যাহা কিছু দেখি তাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন ঋষিগণ সেই এক ঈশ্বরকে পৃথক পৃথক দেবতারূপে অর্চনা করিতেন। তাঁহাদের নবীন নেত্রে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু সকলি দেবতাত্মক জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইত। এই সকল ভৌতিক পদার্থে দৈবশক্তি আরোপ করা মনুষ্য সমাজের আদিমকালের লোকদের পক্ষে স্বাভাবিক। ক্রমে জ্ঞানোন্নতি সহকারে আমরা এই আপাতপ্রতীয়মান বৈষম্যের মধ্যে সাম্য—বৈচিত্রের মধ্যে একতা নিরীক্ষণ করি। বৈদিক ঋষিরাও যে সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে একের ঐশীশক্তি অনুভব করিতেন তাহার নিদর্শন বৈদিক-সূক্তের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়; তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন

একং সদ্বিপ্রাবহুধা বদন্তি
ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ

যিনি এক সৎস্বরূপ তাঁহাকে বিপ্রেরা ইন্দ্র যম বায়ু-প্রভৃতি বহুরূপ বর্ণনা করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং, একমেবাদ্বিতীয়ং' পরব্রহ্মে গিয়া উপনীত হই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মজ্ঞান।

বহির্জগতে যেরূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও এই একতা আরো স্পষ্টরূপ উপলব্ধি করা যায়। আত্মা এক অখণ্ড। নানা চিন্তা, নানা ভাব, নানা প্রবৃত্তির মধ্যে আত্মা সেই একই। আমার আমিত্বসূত্রে আমার সমুদয় জীবন গ্রথিত। এই আত্মার জ্ঞান আছে, স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি আছে, ন্যায় অন্যায় বিবেকবুদ্ধি আছে,—ইহা হইতে আমরা চৈতন্যময়, প্রেমময়, ন্যায় ও করুণার আধার যিনি, এমন পুরুষের পরিচয় পাই। আত্মার কর্ত্তব্যবোধ আছে, সেই কর্ত্তব্যের আদেশ রাজাজ্ঞা হইতেও বলবত্তর। এই আদেশে প্রবৃত্তি সকলকে ঠিক পথে পরিচালন করিবার শক্তিও আমার আছে—তাহাই আমার কর্ত্তৃত্বশক্তি—এই কর্ত্তৃত্ব শক্তির প্রয়োগে আমি আপনাকে স্বাধীন পুরুষরূপে বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার সে স্বাধীনতা পরিমিত, এক উচ্চতর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও পদে পদে প্রতীয়মান হয়। এই নির্ভরের ভাব হইতে ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার নিকট-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। একদিকে যেমন বহিঃ প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পাই, অন্যদিকে তেমনি অন্তর হইতে আত্মার আশ্রয়স্থান পরমাত্মাকে জানিতে পারি, এইরূপে দুইদিক দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আত্মার আয়ত্তাধীন হয়।

জ্ঞানদ্বারা যাঁহাকে পাইলাম তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং, তাঁহার সহিত জীবাত্মার অতিনিকট সম্বন্ধ। যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। কিন্তু বাক্য মনের অগোচর সেই অনন্ত স্বরূপের উপাসনা কিরূপে সম্ভব? সেই অনন্ত স্বরূপকে সমীপস্থ—আত্মস্থ করিয়া না দেখিলে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা হয় না। যখন তাঁহাকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দেখি তখন তিনি দূরে। যখন তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখি তখনই বলিতে পারি

সনো বন্ধু র্জনিতা।

তিনি আমার পিতা, আমার সখা। উপাসনার আগে তাঁহাকে আপনার করিয়া দেখা চাই, নহিলে উপাসনা হয় না।

ব্রহ্মের উপাসনা কি প্রকার তাহা

ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে সংক্ষেপে অতি সুন্দর রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসন মেব"—

তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁর উপাসনা।

তাঁহাকে যখন পিতা ও সখা বলিয়া জানি, যখন দেখিতে পাই আমরা আজীবন তাঁহার করুণায় লালিত পালিত হইতেছি, তখন প্রীতি সহজেই তাঁহার প্রতি ধাবিত হয় এবং সেই প্রীতি সংসারে প্রবাহিত হইয়া সকল স্থানকে মধুময় করে। এই প্রীতি তখন মৈত্রীরূপ ধারণ করে। এখানে আমি একাকী নহি—একাকী একপদ চলিতে অক্ষম। আমার পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, আমার অকাট্য বন্ধন। শুধু তাহা নহে, সমুদয় জগতের সঙ্গে আমার যোগ। সকল জগতবাসী আমার ভ্রাতা। বসুধৈব কুটুম্বকং এ বাক্য শুধু কবির কল্পনা নহে। আমরা মৈত্রী-বন্ধনে স্বদেশ বিদেশকে যুক্ত করিয়া লই। এই মৈত্রীর নিকট ব্রাহ্মণ শূদ্র, আর্য্য ম্লেচ্ছ জাতি বিচার নাই; অহঙ্কার আত্মাভিমান ঘৃণা বিদ্বেষ অপসারিত হয়; সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বিশ্বব্যাপী ঔদার্য্যে বিলীন হয়।

ঈশ্বরের পিতৃভাবের প্রতি লক্ষ্য কর, মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঈশ্বর আমার পিতা, মনুষ্য মাত্রেই আমার ভ্রাতা, কি সহজ, কি উদার ভাব! হায়! কতদিনে এই স্বাভাবিক সৌভ্রাত্র উদিত হইয়া জগৎকে অনুরঞ্জিত ও পবিত্র করিবে। যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইবে, শান্তি ও সদ্ভাবে সকল জনস্থান প্লাবিত হইবে। এই উদার মহান্ ভাব আমরা সকল সময়ে মনে ধারণ করিতে পারি না—যদিও মুখে প্রচার করি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। তাই চারিদিকে এত অশান্তি—তাই আমাদের পারিবারিক, আমাদের সামাজিক অবস্থা এরূপ শোচনীয়। এই ভ্রাতৃভাবের অভাব আমাদের মধ্যে পদে পদে প্রতীয়মান হয়। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করি। তিল প্রমাণ সামান্য মতভেদকে তালপ্রমাণ করিয়া তুলি। আমরা দেশাচারের কঠোর শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসল মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যাই। মৈত্রী বন্ধনের যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের চিরাভ্যস্ত আচার বিচার, সামাজিক রীতি নীতি আমাদিগকে আটে ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, চিরন্তন প্রথা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে এক পদ অগ্রসর হইতে পারি না। মনুষ্যের যে সমস্ত উচ্চ অধিকার, ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মনুষ্য মাত্রেরই যে দাবী আছে তাহা আমরা মনে স্থান দিই না। যে আলোকে এই অধিকার ফুটিয়া উঠে সে আলোক আমাদের নাই। সে আলোক প্রজ্বলিত হইলে আমাদের সমক্ষে কি অভাবনীয় নূতন রাজ্য আবিষ্কৃত হইয়া উঠে। আমরা এক পিতার পুত্র, এক মায়ের সন্তান, আমরা সকলেই অমৃতধনের অধিকারী এই বিশ্বাস যদি আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তবে কোন্ দানবশক্তি ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে? এ আদর্শ গ্রহণ করিলে সমুদয় জগৎ এক নবতর, কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করে। নূতন ধরায় নূতন ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যই আমরা এক পিতার পুত্র, এক ঈশ্বরের উপাসক, এই বিশ্বমন্দির আমাদের সাধারণ পূজার মন্দির; এই সত্য আমাদের মুমূর্ষু

জাতিকে নবজীবন দান করিবে। যে পর্য্যন্ত এই মহান্ ভাবকে আমরা জীবনের কাণ্ডারী করিতে না পারি সে পর্য্যন্ত আমরা দীন হীন মুহ্যমান হইয়া থাকিব। যেমনই রাজ-নিয়ম, যেমনই সামাজিক নিয়ম বন্ধন কর, সকলি নিষ্ফল, সকলি ব্যর্থ। ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিচ্ছেদ, আপনার মধ্যে মান অভিমান দম্ভ অহংঙ্কার এই সকল হীনতার মধ্যে থাকিয়া আমরা অধঃপাতে যাইব। কিন্তু দেখ ভ্রাতৃগণ! আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। ঐ দেখ সুদিন আসিতেছে। উন্নত পবিত্র ধর্ম্মের প্রভাবে দেশ উন্নত ও পবিত্র হইবে। ব্রহ্মই আমাদের ঐক্য স্থল। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের উপাসক হইয়া আমরা সকলে এক হইব। আমরা সকল ভ্রাতা মিলিয়া মাতৃসেবায় নিযুক্ত থাকিব। এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া হে ব্রাহ্মগণ! আমি তোমাদের ডাকিতেছি। উঠ! জাগো! এসো আমরা একত্র হই, মিলিত হই। ব্রহ্মের বিজয় নিশান হস্তে করিয়া দেশে দেশে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করি। ব্রাহ্মগণ, তোমাদের জীবন সত্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল হউক, সেই দীপ নির্ব্বান হইতে দিও না। সেই স্বর্গীয় দীপালোক জ্বলিতে থাকিলে সকলি উজ্বল সকলি পবিত্র হইবে। ব্রাহ্মগণ! এসো আমরা মিলিত হই—একত্র হই। সেই একমন্ত্রে শিক্ষিত, সেই একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অসত্য অনাচার উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াই। আমরা সমুদয় দেশকে এক করিতে চাই আর আমাদের এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর ভিতরে বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ দলাদলি? এই সকল ক্ষুদ্রভাব ভুলিয়া গিয়া পিতার আহ্বান শ্রবণ কর, তাঁর চরণে আসিয়া মিলিত হও—

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখনারে ব্যবধান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবেনা,
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবেনা।
লইব বাটিয়া সকলে মিলিয়া
প্রেমের অমৃতবারি
পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী।

ঈশ্বর প্রীতি হইতে মৈত্রী প্রসূত; মৈত্রী হইতে সেবাধর্ম্মের উৎপত্তি। প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফল, সেবা। আমি যাহাকে ভাল বাসি তাহার সেবা শুশ্রূষা ও আমার ভাল লাগে। যিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসেন, তিনি ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া মানুষকেও অবশ্য ভাল বাসেন এবং মানুষকে ভাল বাসিলে অবশ্য তিনি লোক সেবায় অনুরক্ত হন। এই লোক-সেবাই দেব সেবা—ইহাই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। আমরা আপনার আপনার বলিয়া কার্য্য করিলে প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্য হয় না। ঈশ্বর উদ্দেশে তাঁহার কার্য্য বলিয়া যে কর্ম্ম করি তাহাই তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়।

আমরা কর্ম্ম বিনা ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারি না। যখন আমরা নিশ্চেষ্ট ও অচেতন হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত থাকি তখনো আমাদের প্রাণের ক্রিয়া অজ্ঞাতসারে চলিতে থাকে। দেখ ঈশ্বর স্বয়ং কেমন কর্ম্মশীল, তাঁহার কর্ম্মের বিরাম নাই। গীতায় একস্থানে ভগবান বলিতেছেন, আমি যদি মুহূর্ত্তেকের জন্য কর্ম্ম হইতে বিরত হই তাহা হইলে জগৎ সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া ছারখার হইয়া যায়। আমরা যখন গভীর নিশীথে, নিদ্রায় অভিভূত থাকি তখনো তিনি জাগ্রত থাকিয়া আমাদের অশেষ কাম্যবস্তু বিধান করেন। ঈশ্বরের অধীনে কর্ম্ম করিয়া তাঁহার সহযোগী হওয়া অপেক্ষা আমাদের গৌরব কি হইতে

পারে। আমরা যখন আপনাকে ভুলিয়া লোক হিতকর কার্য্যে রত থাকি—পতিতের উদ্ধার, দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান এই সমস্ত মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠান করি, তখন আমরা ঈশ্বরের সহকর্ম্মী। এই সকল কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য—ইহাই তাঁহার যথার্থ উপাসনা।

উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ প্রদর্শিত হইল তাহা আমাদের প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি বিধান নব-বিধান বলিয়া উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্ম সমাজের এক শাখার নামকরণ হইয়াছে—'নববিধান'। এই নববিধানের অর্থ কি? কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন ইহার অর্থ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। কিন্তু ইহা ত পুরাণো কথা, ইহাতে নূতনত্ব কোথায়? যাহা খাঁটি সত্য তাহা সকল ধর্ম্মেই পাওয়া যায়, প্রধান প্রধান ধর্ম্মতত্ত্বে সকল ধর্ম্মের ঐক্য আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে? দেখা যাক আমাদের ধর্ম্মের নব-বিধান কি। আমার মনে হয় এ ধর্ম্মের দুইটি বিধানকে নববিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম, আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের ব্যবস্থা নির্জ্জনে ধর্ম্ম-সাধন। আপন আপন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনই ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য। তাই আমাদের বর্ণাশ্রমের শেষ ভাগে বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে। এবং আমরা কথায় বলি যে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।" কিন্তু সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা আমাদের একালের নিয়ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ' গৃহে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। পিতা মাতার সেবা, স্ত্রী পুত্র পালন—অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, বিপন্নকে আশ্রয়দান—এ সমস্ত আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। কেবল মাত্র আত্মোন্নতি নহে, কিন্তু যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি আপনার সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজকে উন্নত করা আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সম্মুখে শাসন তন্ত্রের নূতন আদর্শ, সমাজ সংস্কারের নূতন নূতন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষে উদর নির্ব্বাহের জন্য একাকী অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করে। ক্রমে আমাদের মমতা জনসমাজে বিস্তারিত হইয়া পড়ে—তখন প্রত্যেক মনুষ্য সমাজের অন্তরঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্মও এই সামাজিক ভাব ধারণ করে। ঈশ্বরের উপাসনা কেবল নির্জ্জনে নহে—কিন্তু ভায়ে ভায়ে মিলিয়া একস্বরে একমনে ঈশ্বরের পূজায় আমাদের আনন্দ।

দ্বিতীয়—অধিকার ভেদ।

আমাদের শাস্ত্রে অধিকার ভেদে ধর্ম্ম স্তরে স্তরে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাসনায় জ্ঞানীদের অধিকার, অজ্ঞান সাধারণের জন্য পৌত্তলিক পূজা। যখন বৈদিককালের শেষভাগে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তখন তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ঋষিগণ সেই আড়ম্বর পূর্ণ জনসমাজ ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মানুশীলন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সত্য লাভ করিয়া আপনারাই তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে ব্রহ্মজ্ঞান এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিল, সাধারণ জন সমাজে প্রচারিত হইল না। সাধারণ লোকেরা যে সেই রহিয়া গেল, যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ পরিমিত দেবতার উপাসনা দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। আমরা বলি এ নিয়ম ঠিক নহে। যাহা সত্য তাহার প্রতি

উন্নত হইতে হইবে, সত্যকে নিম্নস্তরে আনিয়া আপনার সমকক্ষ করা ভুল। এই নিয়মে অসত্য সত্যের বেশ ধারণ করিয়া সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়। আমরা বুদ্ধদেবের উদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বহুকালব্যাপী গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেই উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান সমগ্র লোকসমাজে প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছি।

অধিকার-ভেদ আবার কি? ব্রহ্মেতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার—মনুষ্য মাত্রেই অমৃতের পুত্র, অমৃতধনের অধিকারী। যদি অজ্ঞান বশত আমার ভ্রাতা আপনার উচ্চ অধিকার বুঝিতে অপারক হয়, তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিব, কিন্তু তাহাকে হীনতর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার অধঃপাতের কারণ হওয়া কি অন্যায় নহে? ভ্রাতৃগণ এসো—আমরা যে ধন পাইয়াছি তাহা সকল ভ্রাতার মধ্যে বাঁটিয়া একত্রে সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে ঈশ্বরের উপাসনা কি, তাহা এক প্রকার সূচিত হইয়াছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্ম, ধর্ম্মের এই তিন অবয়ব। এই তিনের মিলনে ঈশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন উপাসনা হয়। কিন্তু এই ত্রিবেণী সঙ্গম দুর্লভ। পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম হইয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের এক একটি ভাগের বিশেষ প্রাধান্য উপলক্ষিত হয়। কোন ধর্ম্ম জ্ঞান-প্রধান—যেমন উপনিষদ। উপনিষদের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং— ব্রহ্মজ্ঞানী পরব্রহ্মকে লাভ করেন—বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং, জ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়। কোন ধর্ম্ম ভাব-প্রধান, যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্ম; প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব যে ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক। কোনটি খৃষ্টধর্ম্ম সদৃশ কর্ম্ম-প্রধান ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মের প্রভাবে কতশত মহাচেতা কর্ম্মবীর উদয় হইয়া লোকহিতব্রতে জীবন ক্ষেপন করিতেছেন। জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম এই তিন অবয়ব মিলিত হইলেই ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হয়। যে ধর্ম্মে জ্ঞানের প্রাধান্য কিন্তু যেখানে ভক্তি নাই তাহা অসম্পূর্ণ। যে ধর্ম্মে ভক্তিই আছে অথচ জ্ঞান নাই তাহা আংশিক মাত্র। যে ধর্ম্ম প্রধানতঃ কর্ম্মাত্মক, যেখানে ভক্তির নদী প্রবাহিত হয় না, তাহা মরুভূমি তুল্য শুষ্ক। যে ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম সমন্বিত তাহাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ, যাহার আত্মা এই ত্রিরত্ন প্রভায় সমুজ্জ্বল এবং সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাহাতে এই ত্রিবিধ রত্নের কোনটিরই অভাব থাকে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র এই যে

বুদ্ধংশরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

আমরাও সেইরূপ ত্রিত্বের শরণ গ্রহণ করিব। সত্যের শরণ লইব—মঙ্গলের শরণ লইব এবং সত্য মঙ্গলের আয়তন ব্রহ্মের শরণ লইয়া আনন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যেরি জয়।

মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য
খুঁজিব সত্যধন!
জয় জয় সত্যের জয়!

মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান
জয় জয় মঙ্গলময়!

মোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্য গান।
জয় জয় মঙ্গলময়!

সেই অভয় ব্রহ্মনাম
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়,

মোরা করিব না শোক যা হবার হোক্
চলিব ব্রহ্মধাম ?
জয় জয় ব্রহ্মের জয় !

আমি কিছুদিনের জন্য আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমি যে এতদিন এই সমাজের বেদী অধিকার করিয়াছি সে কেবল আপনাদের ঔদার্য্য মনে করিয়া—আমার নিজের এমন কোন গুণ নাই যে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারি। আমি বিষয়ী লোকের মধ্যে গণ্য, অধ্যাত্মিক সংগ্রামে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, এ কথা বলিতে পারি না। আমার কি সাধ্য যে আপনাদিগকে গুরুর ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারি ? আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে যখন যাহা বলিয়াছি তাহার দ্বারা আপনাদের যদি কিছু উপকার হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনাকে ধন্য মনে করিব।

এক্ষণে আমার জীবনসন্ধ্যা সমাগত, রাত্রি আসিবার বড় বিলম্ব নাই। আমার শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইতে চাই। নির্জ্জনবাসে সংসার হইতে কিছুকালের জন্য দূরে থাকিতে চাই। আশা করি আপনারা আমাকে হৃদয়ের একপার্শ্বে স্থান দিবেন।

শকুন্তলায় একস্থানে কবি বলিতেছেন

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোঽর্কঃ
তেজোদ্বয়স্য যুগপৎ ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যতইবাত্মদশান্তরেষু

একদিকে চন্দ্র অস্তমিত হইতেছে, অন্যদিকে সূর্য্য উদিত হইতেছে, রবিশশির এইরূপ উদয়াস্তে যেন লোকের নিজ নিজ দশাচক্র নিয়মিত হইতেছে। আমরা এখন অস্তোন্মুখ, যাঁহারা নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমের সহিত জীবন প্রভাতে প্রবেশ করিতেছেন তাঁহারা আমাদের স্থান অধিকার করুণ। আমি নিরতিশয় আনন্দিত হই যদি কোন সাধু যুবা সমুদিত হইয়া বৃদ্ধের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এইরূপ কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলে আমি দূরে থাকিয়াও তৃপ্তি লাভ করিব।

পরিশেষে আমার আশীর্ব্বাদ এই যে ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুণ। তোমরা সত্য পরায়ন হও, সত্য অন্বেষণ কর, সত্যকে বরণ কর, সত্য হইতে কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবেক না। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। কেবল মাত্র মন্ত্রপাঠে ধর্ম্ম সাধিত হয় না, ধর্ম্মকে জীবনে আনা চাই। ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাসে উপাসনার সার্থকতা হয় না, হৃদয়ে আসন পাতিয়া ঈশ্বরকে স্থায়ীভাবে তাহাতে রক্ষা করা চাই। তোমরা যে আলো নিজে পাইয়াছ তাহা দেশ বিদেশে বিকীর্ণ করিতে যত্নশীল হও। স্বদেশ বিদেশ, পূর্ব্ব পশ্চিম, যেথান হইতে সত্যরত্ন আহরণ কর, তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে। পৌত্তলিকতা উপধর্ম্ম হইতে দূরে থাকিবে, জাতি-বন্ধনের কঠোর শাসন অতিক্রম করিয়া সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে। অতীতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে হইবে অথচ নব্য যুগের বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে তৎপর থাকিয়া উন্নতির স্রোতে প্রাণ মন ঢালিয়া দিবে। এইরূপে তোমরা জ্ঞান ধর্ম্মে আপনারা উন্নত হইয়া আপন ভ্রাতৃবর্গকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পার এই আমার আশীর্ব্বাদ।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ
সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই এক অবর্ণ বিশ্বব্যাপী পরম দেবতা যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজনানুসারে অশেষ প্রকার কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুণ, এই আমার প্রার্থনা।

—

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি)

যদিও কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য পালন করা উচিত, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে—কর্ত্তব্যের সহিত হৃদয়ের ভাব যদি সংযোজিত না হইত, তাহা হইলে এই কর্ত্তব্যের নিয়মরূপ উচ্চ আদর্শটি দুর্ব্বল মানবের পক্ষে প্রায় দুরধিগম্য হইয়া পড়িত। আমাদের জ্ঞানের অনিশ্চিত আলোকের অভাব পূরণ করিবার জন্যই হউক, অথবা কোন অস্পষ্ট কিংবা কষ্টকর কর্ত্তব্যস্থলে আমাদের দুর্ব্বল সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই হউক,—হৃদয়ের ভাবরূপ ঈশ্বরের একটি মহৎ দান আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সমূহের প্রচণ্ড আবেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির সাহায্য আবশ্যক। যেমন সত্যের দ্বারা মন আলোকিত হয়, তেমনি ভাবের দ্বারা আত্মা উত্তেজিত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। বীরপ্রবর (Assas) স্বীয় সৈন্যকে বাঁচাইবার জন্য, আপনাকে যে বলিদান দিয়াছিলেন সে কেবল জ্বলন্ত হৃদয়ের আবেগে—প্রশান্ত জ্ঞানের প্ররোচনায় নহে। অতএব ভাবের আধিপত্যকে যেন আমরা দুর্ব্বল করিয়া না ফেলি ; হৃদয়ের উৎসাহকে যেন আমরা শ্রদ্ধা করি—সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করি। এই হৃদয়ের উৎস হইতেই মহৎ-কার্য্য-সকল, বীরোচিত কার্য্য-সকল সমুদ্ভূত হয়।

আমাদের নীতিতন্ত্র হইতে স্বার্থকে কি একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে? —না। মানব-আত্মার মধ্যে একটা সুখের বাসনা আছে—ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই বাসনাটি—একটা বাস্তব তথ্য; অতএব যে নীতিতন্ত্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এই বাসনাটিরও একটা স্থান থাকা আবশ্যক। মানব-প্রকৃতির নানা লক্ষ্যের মধ্যে সুখও একটি ; তবে, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য কিংবা মুখ্য লক্ষ্য নহে।

মানবের নৈতিক প্রকৃতির ব্যবস্থা অতি চমৎকার! মঙ্গলই তাহার চরম উদ্দেশ্য, ধর্ম্মই তাহার নিয়ম। অনেক সময় ইহার দরুণ মানুষকে কষ্ট সহ্য করিতে হয়, কিন্তু এই কষ্টের দ্বারাই মনুষ্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। সত্য, এই ধর্ম্মের নিয়মটি বড়ই কঠোর এবং ইহা সুখস্পৃহার বিরোধী। কিন্তু ভয় নাই :—যিনি আমাদের জীবনের বিধাতা, সেই মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর এই কঠোর কর্ত্তব্যের পাশাপাশি, হৃদয়ের ভাবরূপ একটি কমনীয় ও মধুর শক্তি আমাদের আত্মাতে নিহিত করিয়াছেন। তিনি সাধারণত ধর্ম্মের সহিত সুখকে সংযোজিত করিয়াছেন ; অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমস্থলও আছে—এবং সেই জন্য তিনি আর একটা জিনিস দিয়াছেন,—জীবনপথের শেষ প্রান্তে আশাকে স্থাপন করিয়াছেন!

আমাদের নীতিপদ্ধতিটি কি—এক্ষণে তাহা জানা গেল। প্রত্যেক তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করা, তথ্যসমূহের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহা ব্যক্ত করা—ইহাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা।

ইহা ব্যতীত, নীতিসম্বন্ধে আমরা কোন নূতন কথা বলি নাই। একটিমাত্র তথ্য স্বীকার করা এবং সেই তথ্যের নিকট অন্যান্য তথ্যকে বলিদান দেওয়া—ইহাই প্রচলিত পন্থা। যে সকল তথ্য আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি, আমাদের নৈতিক পদ্ধতির মধ্যে তাহার প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ কাজ প্রদর্শিত হইয়াছে। বড় বড়

দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই সত্যের একটা দিক্‌মাত্র দেখিয়াছেন।

আজিকার দিনে, কে আবার এপিকিউরসের মতে ফিরিয়া আসিতে পারে—যে এপিকিউরাস, সমস্ত প্রত্যক্ষ তথ্যের বিরুদ্ধে, সহজ জ্ঞানের বিরুদ্ধে, এমন কি সমস্ত নৈতিক ভাবের বিরুদ্ধে, একমাত্র সুখলিপ্সার উপরেই কর্তব্যকে, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন? কেহ যদি ঐ মতে আবার ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার ঘোর অন্ধতা ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতারই পরিচয় দিবেন। পক্ষান্তরে মঙ্গলের (abstract idea) সার-ধারণার নিকট, সুখকে, সকল প্রকার পুরস্কারের আশাকে কি আমরা বলিদান দিব? ষ্টোয়িক সম্প্রদায় তাহাই করিয়াছিল। ক্যাণ্টের ন্যায় আমরা কি সমস্ত নীতিকে অবশ্যকর্তব্যতার মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিব? তাহা হইলে নীতিতন্ত্রকে আরও সংকীর্ণ করিয়া ফেলা হইবে।

এক-ঝোঁকা সিদ্ধান্তের দিন চলিয়া গিয়াছে; আবার উহা আরম্ভ করিলে, দার্শনিক সংগ্রামকে চিরস্থায়ী করা হইবে। প্রত্যেক দর্শনই একটা-না-একটা বাস্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকেই সেই তথ্যটিকে কোন প্রকারে বজায় রাখিতে চেষ্টা করে; সুতরাং প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে একবার জয়ী ও আর একবার পরাজিত হয়; এইরূপে একই দর্শনতন্ত্র ফিরিয়া-ফিরিয়া জনসমাজে আবির্ভূত হয়। যতক্ষণ সমস্ত দর্শনতন্ত্রের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হইয়া আর একটা নূতন দর্শন প্রকাশিত হইবে, ততক্ষণ এই সংগ্রাম থামিবে না।

কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন,—এরূপ দর্শনতন্ত্রের কোন একটা চরিত্রগত বিশেষত্ব থাকিবে না। কিন্তু সত্য ছাড়া, দর্শনের নিকট হইতে আর কোন বিশেষত্ব দাবী করিলে, দর্শনকে লইয়া ছেলেখেলা করা হয় না কি? এই বলিয়া কি কেহ আক্ষেপ করেন যে, যেহেতু আধুনিক রসায়নের অনুশীলন কেবল তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং উহা একটি মাত্র মূল পদার্থে গিয়া পর্য্যবসিত হয় না, অতএব উহার কোন চরিত্রগত বিশেষত্ব নাই? মানব-প্রকৃতির সমস্ত অবয়বগুলি যথাপরিমাণে অঙ্কিত করিয়া মানব-প্রকৃতির একটি যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করাই প্রকৃত দর্শনের কাজ। আমাদের দর্শনতন্ত্রের যে একতা—সে মানব-আত্মার একতা। মানব-আত্মা মাত্রই মঙ্গলকে উপলব্ধি করে; মঙ্গলকে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানে; মঙ্গলকে ভালবাসে; জানে—ভালমন্দ কাজ করিতে তাহার স্বাধীনতা আছে; জানে—তাহার কর্ম্ম অনুসারে সে দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, সুখ দুঃখ ভোগ করিবে। আমাদের দর্শনতন্ত্রে আর এক প্রকারের একতা আছে—অর্থাৎ সমস্ত তথ্যের মধ্যে একটা অখণ্ড ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—সকল তথ্যই পরস্পরকে ধারণ করে, পরস্পরকে পোষণ করে।

একটিমাত্র তত্ত্ব ছাড়া আর কোন তত্ত্বকে দর্শনের মধ্যে আসিতে দেওয়া হইবে না—ইহাকে যদি একতা বলে তবে এরূপ একতা স্থাপন করিবার কাহারও অধিকার নাই। কেবল বিশুদ্ধ গণিতরাজ্যেই এরূপ একতা সম্ভব। গণিতশাস্ত্র তথ্য লইয়া ব্যস্ত নহে; গণিত যে পদার্থের অনুশীলন করে, সরলীকরণের উদ্দেশে তাহাকে সংক্ষেপ করিবার জন্যই তাহার ক্রমাগত চেষ্টা;—এইরূপে উহা কতকগুলি সার-ধারণামাত্রে পরিণত হয়। তথ্যমূলক বিজ্ঞান কতকগুলি সমীকরণের (equation) সমস্যা মাত্র নহে। পদার্থ-

সমূহের মধ্যে যে প্রাণ, আছে এই বিজ্ঞান সেই প্রাণকে সন্ধান করে, এবং প্রাণের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহারও অন্বেষণ করে।

অকল্মষ তপস্যা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতিগমন করে এবং যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে হইবে, কিন্তু কোন্ উপায় দ্বারা? সে উপায়ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন যে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা কর, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই পরং শ্রেয় লাভ করেন। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইবে, কিন্তু তপস্যা কি? জ্ঞানযোগে লব্ধ সত্যের প্রতি চিত্তের ধারণা দৃঢ় করিবার জন্য, তাঁহার শিব সুন্দর স্বরূপে তন্ময় হইবার উদ্দেশে তাহার পুনঃ পুন অভ্যাসের নাম তপস্যা। কিন্তু সে তপস্যাও কি বিঘ্ন-সঙ্কুল নয়? সে পথও কণ্টাকাকীর্ণ অরণ্যবৎ। এই কণ্টকারণ্যকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে নির্দ্দেশ না করিলে তপস্যা সিদ্ধ হয় না। বিঘ্নসহ তপস্যাকে সকল্মষ ও বিঘ্নবিহীন তপস্যাকে অকল্মষ বলে। অকল্মষ তপস্যা শাস্ত্রে "কেবল" এই শব্দের বাচ্য। "কেবল" শব্দ বীজবাচী। যাহা সমুদয় জগতের বীজ তাহা "কেবল"। যেমন বট-কণিকা বট-মহা বৃক্ষের বীজ, তেমনি যে বীজ হইতে—যে মহাপ্রাণ হইতে এই বিশ্ব-প্রাণ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যে মহাসত্য হইতে এইজগৎ-সত্যের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা "কেবল"। তাহা পাইতে হইলে তৎপ্রাপক অকল্মষ তপস্যাও কেবল, কিনা বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

কৈবল্য লাভের জন্য তপস্যাকে যেমন কেবল করিতে হয়, তপস্যার ভূমিকেও সেইরূপ তাহার অনুকূল করিতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার নির্দ্দেশ এইরূপ করিয়াছেন।

> সমে শুচৌ শর্করা বহ্নিবালুকা
> বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
> মনোঽনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে
> গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ।

কঙ্করশূন্য, তপ্তবালুকা বর্জ্জিত, সমান ও শুচিদেশে, উত্তম জল, উত্তম শব্দ, ও আশ্রয়াদির দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাদীর অনভিমুখে ও সুন্দর বায়ু সেবিত বিমল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক। এইরূপে স্থান নির্ব্বাচন করিলেই যে তপস্যা অকল্মষ হয়, তাহা নহে। এইবার বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর-জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। মনে কর তুমি পবিত্র স্থানে বসিয়া জ্ঞানযোগে ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হইয়াছ, তাঁহাতে চিত্ত সমাধানের চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু বৃশ্চিক-দংশকের ন্যায় দ্বাদশটি শত্রু আসিয়া তোমার অন্তরে এমন দংশন করিতে লাগিল যে, তোমার চিত্ত তাহাতে বিক্ষিপ্ত না হইয়াই থাকিতে পারে না, তোমার মন মলিন না হইয়াই থাকিতে পারে না। কাহাদিগকে এই দ্বাদশ শত্রু বলিব, তাহারা কে? তপস্যার এই দ্বাদশটি আন্তরিক শত্রুর নাম—ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহ, বিবিৎসা,

অকৃপা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষা এবং জুগুপ্সা। এই দ্বাদশটি দোষ থাকিতে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, ইহারাই তপস্যার কল্মষ অর্থাৎ মল। এই জন্য ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যেমন ব্যাধেরা মৃগ পক্ষীদিগের ছিদ্রান্বেষণ করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে, তেমনি উক্ত দ্বাদশ দোষের প্রত্যেক দোষই মনুষ্যদিগের চিত্ত-মন্দিরে প্রবেশের জন্য অনুক্ষণ ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে এবং অবসর পাইয়া তাহাদিগের তপস্যা নষ্ট করিতেছে—ক্রোধাগ্নি যখন জ্বলিয়া উঠে তখন জীব দগ্ধ বিদগ্ধ হয়, কাম ব্যসনে নিমগ্ন করিয়া মানুষকে রসাতলে পাতিত করে, লোভ পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা ও উপযুক্ত পাত্রে স্বোপার্জ্জিত ধন দানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ধর্ম্মহীন করে, মোহ কর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া জড়বৎ উদ্যম-হীন করে, বিবিৎসা নানা প্রকার ভোগরসে ভাসমান করাইয়া তাহাকে ব্যাধি জরাতে জর্জ্জরিত ও অশেষ দুঃখভাজন করে, অকৃপা সুন্দর কোমল হৃদয়কে লৌহবৎ কঠিন নিষ্ঠুর করে, অসূয়া তাহাকে পরগুণ দর্শনে অন্ধ করে, মান তাহাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠা হইতে শূন্যে উঠাইয়া অধঃপাতিত করে, শোক ইষ্টবিচ্ছেদ ভয়ে ভীত ও বিহ্বল করে, স্পৃহা বিষয় ভোগেচ্ছায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে, ঈর্ষ্যা পরশ্রীতে কাতর করে এবং জুগুপ্সা পরগুণ আচ্ছাদনে প্রবৃত্ত হইয়া সূচীসূত্র যোগে মলিন ছিন্ন বস্ত্র সীবনে নিযুক্ত হয়। তাই হরিভক্তিপরায়ণ কবীর দাস বারানসীর গঙ্গাতীরে বসিয়া এই সকল হৃদ্‌মল পরিপূর্ণ গঙ্গাযাত্রীদিগকে গঙ্গাস্নান ও বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র ও আচারবান মনে করিতে দেখিয়া দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে "এতেনা ছুৎভইয়া তোহেরে সাথ কহেত্ কবীর কৈসে ভইলে আচার"।

কিন্তু আভ্যান্তরিক এই দ্বাদশ প্রকার কল্মষেই সব শেষ হইল না। তপস্যার প্রতিকূলে এখনো সাত প্রকার নৃশংসতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারাও তপস্যার কম অন্তরায় নহে। বুদ্ধিকে বিষয় নিমগ্ন রাখা, বিষ যেমন অপকার করে—শরীরকে জ্বালাইয়া দেয়, সেইরূপ পরের অপকার করিয়া, পরকে জ্বালাইয়া, নিজেকে বড় মনে করা; দান করিয়া পরে তাহার জন্য অনুতাপ করা, অর্থলোভে মানাপমান জ্ঞান শূন্য হওয়া, ভ্রান্তিজাল ও মলিন সংস্কার সমূহে জ্ঞানদীপকে প্রচ্ছন্ন রাখা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া পরের দুঃখে সন্তুষ্ট হওয়া এবং পতিব্রতা ভার্য্যার প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়া, এই সাতপ্রকার নৃশংসতা তপস্যার অন্যবিধ কল্মষ।

আমাদের ভারতবর্ষের অরণ্যে, নদীতীরে, গ্রামান্তে এবং পর্ব্বত গাত্রে কল্মষ যুদ্ধের সহস্র সহস্র সেনানিবাস—দেবমন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—যুগ-যুগান্ত কালের স্মৃতি-চিহ্ন এখনো কত কত ভগ্ন মন্দির এবং তাম্র-ফলকে প্রকাশিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে সকল স্থানে সে কল্মষ-যুদ্ধ হয় না—তপঃশ্রীসুন্দর তপস্বী আর সে সকল স্থানে পরিদৃষ্ট হন না, পরন্তু এখন সেই সকল পবিত্র স্থানে রিপুকুল সহায়, কামরত ধনঞ্জয় পুরুষেরা বিহার করে। পঞ্চবিংশ শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের প্রসিদ্ধ মার যুদ্ধ আর কিছুই নহে, সে কেবল এই আন্তরিক কল্মষগণের সহিত তাঁহার প্রখর যুদ্ধ। তিনি অন্তরস্থ এই পাপ সকলকে সাধন-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁর শরীরের অস্থিখণ্ডের

পর্য্যন্ত এত আদর। যখন সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মহাপুরুষ বোধিবৃক্ষ মূলে তপস্যা-লব্ধ বোধি লাভার্থ আসনে উপবেশন করিয়া একান্ত মনে সাধন তৎপর ছিলেন, তখন পুত্র কন্যা পারিষদবর্গসহ মার আসিয়া তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া প্রবৃত্তি-মার্গে লইয়া যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বুদ্ধদেব সেই পাপ-বুদ্ধিকে বলিলেন কি? বলিলেন যে,

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

এই আসনে যদি আমার শরীর শুষ্ক হয়, ত্বক্ অস্থি মাংস যদি লয় প্রাপ্ত হয়, তথাপি বহু-কল্প-দুর্লভ বোধিকে লাভ না করিয়া এই আসন হইতে আমার শরীর বিচলিত হইবে না। তিনি পুনরায় বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বেয়ং ত্রিসাহস্রং মেদিনী যদি মারৈঃ পূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথমেরু পর্ব্বতবরা চাণীষু গড়্গা ভবেৎ।
তে মহ্যং ন সমর্থ লোম চালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহেস্ম বর্ম্মিতেন দৃঢ়ম্॥"

যদি এই ত্রিসহস্র মেদিনী মারের দ্বারা পূর্ণ হয় এবং মেরু অবধি যাবদীয় পর্ব্বত তাহার হাতের খড়্গ হয়, তথাপি আমার প্রাণ নাশের পূর্ব্বে তাহারা আমার একটি লোমকেও চালিত করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তাহারা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তোমরা জানিও যে দৃঢ় বর্ম্মের দ্বারা আমি আবৃত আছি।

বৈদিক যুগের দেবাসুরের যুদ্ধও আর কিছুই নহে, সেও কেবল, অন্তরস্থ এই কল্মষ অসুরগণের সহিত সাধন যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে পবিত্র করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দেবতা। আত্মোদ্ধার, আত্মরক্ষা বড়ই কঠিন কার্য্য। দেবতারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দেবতা।

দেবতা কে?

"দেবা দীব্যতে র্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ"

শাস্ত্র নির্ণিত প্রকাশাত্মক ইন্দ্রিয় বৃত্তির নাম দেবতা। আর এই প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বৃত্তির প্রাণন ক্রিয়ার মধ্যে থাকিয়া সেই বৃত্তির প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে বিপরীত পথে পরিচালনকারী যে বৃত্তি তাহাই অসুর। অন্য কথায় যাহা তমআত্মিকা বৃত্তি, তাহাই অসুর। আত্মস্বভাব পরিরক্ষার জন্য এই দেব এবং এই অসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল—বাণে বাণে নহে, অস্ত্রে অস্ত্রে নহে, কিন্তু দমনে দমনে, প্রত্যাখ্যানে প্রত্যাখ্যানে। দেবতারা যুদ্ধ জয়াভিলাষী হইয়া ওঙ্কার প্রতিপাদ্য সত্যের শরণাপন্ন হইলেন এবং নাসিকাস্থিত চৈতন্য-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া সত্যের কিনা ওঙ্কারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নাসিকা-স্থিত চৈতন্যশক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া পাপবুদ্ধি অসুরেরা আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিবা মাত্র তিনি সুগন্ধ আঘ্রাণের সহিত দুর্গন্ধও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন; অতএব তাঁহার পরাজয় হইল। অতঃপর দেবতারা বাক্যস্থিত চৈতন্যশক্তিকে অব-লম্বন করিয়া ওঙ্কারের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বাক্যস্থিত চৈতন্য-শক্তিরও সে দৃঢ়তা না থাকায় পাপাত্মিকা অসুরেরা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিল, তিনিও যেমন সত্যবাক্য উচ্চারণ করিলেন, তাহার সহিত মিথ্যাও বলিতে লাগিলেন। তাঁহারও পতন হইল। এখন চক্ষুর পর্য্যায় পড়িল। চক্ষুকেও অসুরেরা আসিয়া পাপে বিদ্ধ করিল। চক্ষু তখন দর্শনীয় এবং অদর্শনীয় উভয়ই দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু জয়-লাভ করিতে পারিলেন না।

শ্রোত্রস্থিত চৈতন্যশক্তির দ্বারা দেবতারা উদ্গীথের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিও দান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং অসুরেরা আসিয়া যেমন তাঁহাকে স্পর্শ করিল অমনি শ্রবণীয় এবং অশ্রবণীয় উভয়ই শুনিতে লাগিলেন এবং পতিত হইলেন। এইবার মনন-শক্তি উদ্গীথ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরেরা আসিয়া তাঁহাকে পাপে বিদ্ধ করিল, মন সঙ্কল্পনীয় এবং অসঙ্কল্পনীয় উভয়ই মনন করিতে লাগিলেন। মন অসুর যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। এইবার দেবতারা আপনাদের আধার স্বরূপ মুখ্য প্রাণকে তাঁহাদের নেতৃত্বে বরণ করিলেন। প্রাণ স্বভাবতই দমসাধন সম্পন্ন ও নিষ্কাম। তিনি আপনার শক্তির দ্বারা চক্ষু, কর্ণ মনাদির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন, দেহে শক্তি সঞ্চার করেন, কিন্তু তজ্জন্য স্বয়ং কোন গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করেন না, নিজে অমানী হইয়া অন্যের মান প্রদান করেন, নিজের প্রাণদানে অন্যকে প্রাণবন্ত করিয়া স্বয়ং অপ্রতিগ্রাহী ও বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থান করেন—"দেদা রহে না চুগে ভোগ"। এরূপ স্বভাবসিদ্ধ মুখ্যপ্রাণ যখন দেবতাদিগের প্রতিনিধি রূপে উদ্গীথ-যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তমআত্মিকা অসুরবর্গ আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। তাহাতে ফল হইল এই যে, লৌহ-খণ্ডে পতিত মৃৎপিণ্ড যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেই নিষ্কাম নির্ম্মল মুখ্যপ্রাণে পতিত হইয়া অসুরগণ বিনষ্ট হইল। দেবতারা জয়ী হইলেন। দমনই দেবতার মহাস্ত্র। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী ছিলেন, দেবতারা সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের সন্ধিস্বরূপ থাকিয়া সৃষ্ট-জগতে গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই ধর্ম্মের এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিন্তু আমরা গৃহে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম সাধন করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র শান্তিকর আশ্রয়ে বিশ্রাম করিতে চাই, আমাদিগকে কোন্ মহাব্রত যাপন করিতে হইবে? মহাভারতে মহর্ষি সনৎকুমারই তাহা শিক্ষা দিয়াছেন—

> জ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ দম শ্রুতঞ্চ
> অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া।
> যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শমশ্চ
> মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥

জ্ঞান, সত্য, দম, অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, উপাসনা, দান, ধৈর্য্য, শম, এই দ্বাদশ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণের মহাব্রত। এই দ্বাদশ মহাগুণ পরম পুরুষার্থ গৃহের দ্বার স্বরূপ। এই দ্বার দিয়াই পরমাত্মজ্ঞানে প্রবেশ করিতে হয়—যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ তত্ত্ব জানিয়াছেন, সত্য ভাষণের দ্বারা বাক্যকে পবিত্র ও পরোপকারের দ্বারা প্রাণিগণের হিতসাধন করিয়াছেন, মনকে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার অধীন করিয়াছেন, এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র উপনিষদাদি অধ্যয়ন দ্বারা তাহার মূল সত্যের অনুসরণ করিয়াছেন, গুণীর গুণ দর্শনে যাঁহার চিত্ত হৃষ্ট হয় এবং অকার্য্য করিতে যাঁহার লজ্জা হয়, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ ও মানাপমানাদিতে যাহার তুল্য জ্ঞান, পরছিদ্র অনুসন্ধান করা যাঁহার রুচিবিরুদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞান-যজ্ঞে যিনি নিয়ত সমিন্ধন করেন, যিনি দাতা এবং বিষয় সন্নিধান সত্তেও যিনি তাহাতে লোভাহত না হইয়া তৃষ্ণাকে শান্ত রাখিতে পারেন, পরমাত্মজ্ঞানে প্রবেশের দ্বার তাঁহারই নিকটে উন্মুক্ত, তিনিই পরমাত্মজ্ঞানী, তিনিই সাধনায় সিদ্ধ।

সাধন-পথের পথিককে সর্ব্বদা সাবধানে পদক্ষেপ করিতে হয়। যিনি সর্ব্বদা

সাবধান ও বা অপ্রমত্ত, তাঁহাতে আট প্রকার গুণের আবির্ভাব হয়। সে আট-প্রকার গুণ কি তাহা অবধারণ কর—সত্য, ধ্যান, সমাধান, জিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অসংগ্রহ। সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করা সাধকের সহজসাধ্য হয়, তিনি সমাধিতে অভিনিবিষ্ট হইলে পরব্রহ্ম ও তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয় না। আমি কে? কাহার আমি এবং কোথা হইতে, কি প্রকারে এই জগতে আসিলাম, এই প্রশ্নের উত্তর আপনিই তাঁহার মনে উদয় হয়। তখন কি ঐহিক, কি পারত্রিক বিষয়ভোগের ইচ্ছা আর তাঁহার থাকে না—তখন ব্রহ্মানন্দই তাঁহার একমাত্র ভোগ্য হয়। সনৎসুজাত ঋষি শোকাচ্ছন্ন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন এবং আমিও আমার সমধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মভ্রাতৃবর্গকে সেই মন্ত্রই বলিতেছি যে,

> সত্যাত্মাভব রাজেন্দ্র সত্যে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
> তাংস্তু সত্যমুখানাহুঃ সত্যেহ্যমৃতমাহিত ম্।

হে রাজেন্দ্র, তুমি সত্যাত্মা হও, সত্যেই সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত। সত্যদর্শীগণ বলিয়াছেন যে, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এ সকল সত্য-প্রধান এবং সত্যেতেই অমৃত এবং মোক্ষ নিত্য বিদ্যমান। এই শরীর থাকিতে থাকিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রোধাদি দোষ বিনাশ করিয়া তপস্যা ও ব্রত আচরণ করিবে। দোষ নিবৃত্ত হইলে তপস্যাদিতে সিদ্ধি লাভ করা যায়, ইহা ঈশ্বরকৃত নিয়ম। সত্যই অর্থাৎ পরব্রহ্মই সাধুদিগের ব্রত অর্থাৎ নিত্য বিজ্ঞেয়। যাহা পূর্ব্বোক্ত ক্রোধাদি দোষে অস্পৃষ্ট ও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদি গুণে যুক্ত, সেই তপস্যাই সমৃদ্ধ ও কেবল। কেবল শব্দে ব্রহ্মকে এবং কেবল শব্দে ব্রহ্ম লাভের হেতুকে বুঝায়। ঈদৃশ নিষ্কাম তপস্যা ও ব্রত, জন্ম মৃত্যু ও জরা অপহরণ করিতে সমর্থ। জন্ম, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিলেই ব্রহ্মসম্ভোগ লাভ হয়।

> ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং
> প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং।

পরমপিতা পরমেশ্বর।

যাঁহাকে লইয়া আমাদের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, যাঁহার বিষয় কথোপকথন করিতেছি, তিনি কে? তিনি আমাদের পরমপিতা। তাঁহাকে জানা অতি সহজ নয় কি? তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া উহা পালন করিতেছেন। তাঁহার সৃষ্টি-কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে দেখিবে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে পাইবে তিনি সকলেতে বিরাজমান। মনুষ্য, জীবজন্তু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, কোন্‌টি না সুন্দর? প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখ, প্রত্যেকটিই সুন্দর লাগিবে। পরমপিতা নিজে সুন্দর। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল অপূর্ব্ব এবং প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থও সুন্দর। তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়া সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। মঙ্গলময় পিতার মঙ্গল-ভাব সকলেতে নিহিত! তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার ব্যবস্থা, তাঁহার অভিপ্রায় সকলই মঙ্গল। তাঁহাকে পিতা বলি কেন? তিনি পিতার ন্যায় দিবারাত্র আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তিনি পিতৃরূপে বিশ্ব-সৃজন করিয়া সকল মনুষ্যকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, তিনিই মঙ্গলোদ্দেশে এই বিশ্বলোক প্রসূত করিয়া জননী সমান পালন

করিতেছেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইতেছে, মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। আমরা তাঁহাকে না জানিলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সব জানিতেছেন, সর্ব্বদর্শী সব দেখিতেছেন; আমরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে কিম্বা অন্যায় কাজ করিলে তাঁহার নিকট গোপন থাকিবার যো নাই, কেন না তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী; কিন্তু আমরা চিরদিন এরূপ অজ্ঞানে থাকিলে আমাদের মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয় না। তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে অন্য জীবজন্তুর প্রভেদ কি রহিল। আমরা নিজ নিজ দোষের জন্য প্রতিনিয়ত দুঃখে কষ্টে নিপতিত হই। পরমেশ্বরই হৃদগত শুভবুদ্ধি দ্বারা শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই সকল দুঃখ কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া নিজের কাছে আনয়ন করেন। তিনি আমাদের কি না দিতেছেন। আমাদের যে কোন কিছুরই অভাব নাই! আমাদের যাহা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্ব হইতে তিনি জানিয়া, তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন এবং সকল অভাব মোচন করিতেছেন। তাঁহার নিয়ম অনুযায়ী চলিলে কেন আমাদের কষ্টে পড়িতে হইবে? এই পৃথিবীকে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা পুষ্প ফল এবং নানাবিধ জীবজন্তুর দ্বারা আমাদের জন্য কেমন সুশোভিত করিয়াছেন এবং তাহাতে আমাদের স্বাধীন ভাবে কেমন বিচরণ করিতে দিয়াছেন। আমরা এখানে আরামে সে সকল বস্তু কেমন উপভোগ করিতে পারিতেছি। তিনি আমাদের জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তাহার উপর নিজেকে পর্য্যন্তও দান করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। কিন্তু এই মহৎ দানেও তাঁহার অহঙ্কার নাই; মহৎ কার্য্যেও তাঁহার গর্ব্ব নাই। যাহার যাহা আবশ্যক তাহা তিনি প্রতিনিয়ত যোগাইতেছেন, অথচ ভক্তের কাছে তিনি নিজে পড়িয়া আছেন। এত নম্র-ভাব সেই দেব-দেব ব্যতীত আর কাহারও কি সম্ভবে?

তাঁহার মত ঐশ্বর্য্যশালী কে আছে? তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, অথচ তিনি দীনহীন ভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লুক্কায়িত আছেন। কখন তাঁহাকে দয়া করিয়া ডাকি, কখন বা তাঁহাকে প্রীতি-উপহার দিই। এ যেন আমাদেরই তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ। যদি তাঁহাকে একবার ভালবাসি, এই ভিক্ষা টুকুর জন্য তিনি যেন লালায়িত। এই ভালবাসাতে যেন তাঁহার জোর নাই। তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়া ভক্তের কাছে ভালবাসাটুকু কেবল ফিরিয়া চান। আমাদের প্রেমময় প্রেম দিয়া প্রেম চান। আমাদের কাছে তাঁহার এই ভিক্ষা। আমরা সর্ব্বস্ব পাইয়া এই ভিক্ষাটুকু দিতে কি কাতর হইব? কোথায় আমরা তাঁহার চরণ সেবার জন্য পড়িয়া থাকিব, তা নয়, তিনিই আমাদের কাছে নিজেকে দান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার এত নম্রতা দেখিয়া কি আমাদের নম্র হইতে ইচ্ছা যায় না? আমি যে মহান্, এই বলিয়া তাঁহার কি অহঙ্কার ও অভিমান আছে? এ মহৎ দৃষ্টান্তে কি আমাদের জ্ঞানশিক্ষা হয় না? আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে সেই মহত্তের ভাব ব্যক্ত করা অসাধ্য। আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে চেষ্টা করিয়া ভাল হওয়া চাই, যাহাতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রিয় কাজ করিয়া তাঁহার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারি। অনবরত চেষ্টা, অনবরত উদ্যম, অনবরত সাধ্য সাধনা দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। তিনি সবেতে অপরিমিত, অসীম, তিনি

আমাদের কাছে বর্ণনাতীত। তিনি নিজের কার্য্যে নিজে সর্ব্বদা বিভোর। তাঁহার সুখও নাই দুঃখও নাই। তাঁহার হর্ষও নাই বিষাদও নাই। অথচ তিনি পরিপূর্ণমানন্দং তিনি সর্ব্বদা আনন্দময়। তাঁহার উদার ভাবের, তাঁর নিস্বার্থ দানের কণামাত্রও লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করা উচিত। আমরা অশেষ গুণে যতই মহৎ হই না কেন, তাঁহার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হইতে পারে? তিনি অতুলনীয়। যিনি আমাদিগকে আজন্মকাল লালনপালন করিতেছেন, যিনি আজীবন জ্ঞানশিক্ষা দিতেছেন, সেই এক পরমেশ্বরে মাতার পালনীশক্তি ও পিতার গুরুত্ব এই উভয় ভাব দেখিতে পাই বলিয়া তিনি আমাদের পিতা ও তিনিই আমাদের মাতা। তাঁহার মত পূর্ণ মহৎভাব আমাদের নাই বলিয়া আমাদের কার্য্য সীমাবদ্ধ, পরিমিত ও অপূর্ণভাবে থাকে। তিনি আমাদের স্রষ্টা, তাঁহার কৃপায় যে সকল সদ্‌গুণ লাভ করি, তাহাতে কি আমরা পরিপূর্ণভাবে তাঁহার সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারি? তাহা নয়। আমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পদানত হইয়া তাঁহার চরণ সেবার উপযুক্ত হইলেই আমাদের জীবন আমাদের জন্ম সার্থক হইবে। সেই পরমপিতা পরমমাতাকে জানিবার জন্য আমরা আমাদের পিতামাতাকে পাইয়াছি, যিনি তাহাদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাকে জানিবার কত না উপায় করিয়া দিয়াছেন।

সেই সত্য-জ্যোতিকে পাইতে হইলে অন্তর শুদ্ধি করিয়া আত্মজ্যোতি দ্বারা পাইতে হইবে। সেই পবিত্রময় ও প্রেমময়, বিশুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র ভাব ও পবিত্র প্রেম আমাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন। আমরা কি তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিব না? কেহ ভাল বাসিলে কি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা যায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশাল সৃষ্টির রচনাতে যখন তাঁহার জ্বলন্ত আবির্ভাব, যখন সকল বস্তুতে তিনি বর্ত্তমান, যখন অন্তরের অন্তরের মধ্যে তিনি বিরাজমান, আমরা সত্য সত্য এতই কি অজ্ঞ, এতই কি অন্ধ, যে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার মহিমা গাহিতে পারিব না। সকল মনুষ্যের ও সকল জীব জন্তুর পিতামাতা সেই একমাত্র ভগবান, তাঁহাকে আমরা নিজ নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি। আহা! তাঁহাকে কি রূপে ভাল না বাসিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিব। আমাদের জীবন কি বৃথা যাইবে। যাঁহাকে জানিয়া যাঁহাকে প্রীতি করিয়া যাঁহার প্রিয় কাজ করিয়া উপযুক্ত সন্তান হইবার জন্য এই মনুষ্য জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির দ্বারা পূজা করিলে তবে না আমাদের মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইবে। তাহা না হইলে অন্য জীব জন্তুর সঙ্গে আমাদের কি প্রভেদ রহিল। অন্যান্য জীব জন্তু অজ্ঞানে এবং বৃক্ষ লতাদি জড় পদার্থ সকল প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিতেছে, তাহারা জড় পদার্থ হইলেও তাহাদের মধ্যে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। আর আমরা স্বাধীন মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানে উন্নত হইয়া তাঁহার আদেশ এবং তাঁহার নিয়ম কি পালন করিব না? তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া তাঁহাকে কি প্রসন্ন করিব না? সর্ব্বত্র তাঁহার সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম। কোথাও একটু বিশৃঙ্খলা নাই। আমরাও যদি তাঁহার অনুকরণ করিয়া ও তাঁহার অনুসরণ লইয়া ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র ভার সুশৃঙ্খলার সহিত

চালাইতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল।

পরমপিতা পরমেশ্বর এত বড় জগত সংসারের ভার লইয়া অনুক্ষণ তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি আমাদের শরীর মন আত্মার মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তিনি আমাদের কল্যাণ চান। তাঁহার অভিপ্রায় যে আমরা মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যের মত কার্য্য করি। মাতার গর্ভে কে আমাদিগকে পরিপুষ্ট করিলেন? ভূমিষ্ঠ হইলে কাহার করুণায় বর্দ্ধিত হইলাম? কে আমাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিলেন? জন্মে মৃত্যুতে স্বদেশে বিদেশে, নিকটে দূরে, সময়ে অসময়ে, সুখে দুঃখে সকল কালে তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু। আমরা যে স্থানে ব্যাপককাল ধরিয়া থাকি, সেখানকার জন্য আমাদের কত না মায়া বসে। সে স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে কত না কষ্ট বোধ হয়? যে জীব জন্তু আমাদের কাছে থাকে, তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে তাহাদের উপর কত না ভালবাসা জন্মে, বৃক্ষ লতাদি রোপন করিলে উহাকে যত্ন করিয়া বাঁচাইতে এবং বর্দ্ধিত করিতে কত না ইচ্ছা যায়। নিজের ঘরের জিনিষ গুলির উপর কত না মায়া বসে। তাহাদিগকে প্রতিদিন তুলিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া যত্নে আদরে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতে কত না ইচ্ছা যায়। দাস-দাসীর পরিচর্য্যায় কত না মুগ্ধ হইতে হয়, তাহাদের উপর কত না মায়া জন্মে। অনেক স্থলে তাহাদের কার্য্য-দক্ষতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কত প্রভুভক্ত ভৃত্য আমাদের নিকট নিজ সন্তানবৎ হইয়া পড়ে। সাংসারিক নানা অবস্থায় পড়িয়া আমরা আত্মহারা, কিন্তু আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর, যিনি আমাদের নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে কি সত্যসত্যই ভুলিয়া থাকিব। এই পরমপিতাকে পাইবার জন্য কত শত ধর্ম্মাত্মা নিজের জীবন হারাইয়াছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি ভালবাসার পরিচয়, মহৎ-জীবন মহৎ-চরিত্র ব্যতীত কয় জন লোক দিতে পারে, অথচ তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের নিজস্বধন। আমরা নিজ নিজ সংসারের মায়ায় এতই মুগ্ধ হইয়া আছি, যে তাঁহাকে বুঝিতে ধরিতে ছুঁইতে অসমর্থ। তিনি আমাদের মত সাংসারিক লোককে শীঘ্র দেখা দেন না। আমরা সংসারের কাজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন যে নমস্কার সেটিও দিন মধ্যে একবার করিতে পারি না; কি আশ্চর্য্য! যিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে প্রত্যেক জীব-জন্তুকে আশ্রয়দান করিতেছেন, যাঁহার আবির্ভাব সকলেতে রহিয়াছে, তিনি আমাদের নিকট হৃদয়ের প্রীতি ভিক্ষা করেন, দরিদ্রের ন্যায় হৃদয়-প্রান্তে অবস্থান করেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে এই সামান্য ভিক্ষা দিতে কাতর, তঁাহাকে দূরে রাখিতে সচেষ্ট, এ কি ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা। হায় আমরা তাঁহার অমৃতের অধিকারী হইলাম না, আমাদের দুর্দ্দশার সীমা কোথায়। একবার তাঁকে প্রেম দিয়া দেখ দেখি, প্রেমের হিল্লোলে হৃদয় উথলিয়া উঠিবে। ভক্তি শ্রদ্ধা যাহা তাঁহাকে অর্পণ করিবে, তাহার ক্ষয় নাই। তিনি সকলই দান করিয়া আমাদিগকে ধনী করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জন্য আমরা কি করিতেছি। ভালবাসা কেহ জোর করিয়া দেওয়াতে পারে না, কিংবা উহাকে কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। ঐ জিনিষটি স্বেচ্ছার জিনিষ। তাঁহাকে ভালবাসিলে তিনি ঐটি কেবল

আমাদের কাছে গ্রহণ করেন,—কেন না ঐটি আমাদের নিজস্বধন।

এই ভালবাসাটুকু দিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়া উঠে। আমরা তাঁহাকে ভালবাসিলে পাপ কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি চলিয়া যায়। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার কাছে কোন অপ্রিয় কাজ করিয়া ঘৃণিত বা লজ্জিত হইতে ইচ্ছা যায় না। যখন আমরা ভাই ভগ্নি স্বামী পুত্র এ সকলকে ভালবাসি, ইহাদের জন্য কত না প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা যায়। যখন তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে কি পরাঙ্মুখ হইব? তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? যখন তাঁহার অভাবে কাতর হইয়া পড়ি, নিরাশ হৃদয়ে কাঁদিতে থাকি, তখন সেই দয়াময়ের করুণা বারিতে আমাদের চিত্ত ভাসিয়া যায়, তখন মানস-সরোবরের প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্মে জ্যোতির্ম্ময় পরমপিতাকে দেখিয়া কৃতার্থ হই।

পরমাত্মা আমাদের আত্মার ভিতর স্থিতি করিতেছেন, সেই আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা চাই। সেই সত্যজ্যোতি আত্মজ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই কারণে দূরে যাইতে হয় না। নিজ আত্মাই পরমাত্মার আলয়। নিজ হৃদয়-কোষে তিনি বর্ত্তমান। তিনি আমাদের কত যত্নের ধন।

পরমপিতা। আমরা তোমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছি। আমাদের শিক্ষার ভার তুমি গ্রহণ কর। আমরা তোমার পুত্র কন্যা। এখনে তোমাকে সম্পূর্ণ রূপে না জানিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে রহিয়াছি। তুমি শিক্ষার ভার লইলে আমাদের পরমার্থ জ্ঞান জন্মিবে। ভগবন! তুমিই যথার্থ পিতা, তুমিই যথার্থ সকলের মাতা। যাহাতে আমরা শিক্ষার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তোমার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারি, সেইরূপ আমাদের জ্ঞান-শিক্ষা দাও। আমরা তোমার প্রতিনিধি হইয়া পিতা রূপে মাতা রূপে ধরায় আসিয়াছি। কিন্তু তোমার অভিপ্রায় মত কাজ করিলাম কৈ? পিতা মাতার ভার লইয়া তোমার মত শিক্ষাদান, তোমার মত সন্তান পালন করিলাম কোথায়? পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব আমাদের কোথায়? তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের অন্তরে থাকিয়া পিতার ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে শিক্ষা দাও। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যপালন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি, ভাই ভগ্নির প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন, আত্মীয় স্বজন—দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার, এই সকল উচ্চতম শিক্ষা তোমার কৃপায় লাভ হয়। তোমার মত দয়া, স্নেহ, ক্ষমা মমতা কোথায় পাইব? তোমার মত নিকটস্থ আত্মীয় আমাদের আর কে আছে? পিতা মাতা, ভাই, ভগ্নি, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা ইহাদের সহিত চিরসম্বন্ধ হইতেই পারে না। কালে যখন সকলে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে, যখন কেহই নিকটে থাকিবে না, একমাত্র তুমিই আমাদের আশ্রয় রহিবে। তোমা ব্যতীত আর কাহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিব। যতদিন আমরা পৃথিবীতে-বিচরণ করিব ততদিন আমরা মায়াতে মুগ্ধ হইয়া যেন এই ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত না হই। তোমার সঙ্গে আমাদের চিরস্থায়ী সম্বন্ধ, নিত্য যোগ। তোমার আশ্রয়েই প্রকৃত আরাম ও মনের চরম শান্তি। তোমাকে ভুলিয়া থাকিলে অশান্তি ও অসন্তোষের দ্বারা বিদ্ধ হইতে হয়। তোমাকে মনে স্থান না দিয়া আমাদের

আরাম কোথায়? ভক্তি ও ভালবাসা না থাকিলে কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায় না। এই দুইটির প্রেরণায় কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা সুসিদ্ধ হয়। কোন জিনিষ ভুয়া হইলে উহা যেমন বাহিরে সুন্দর ভিতরে অসার, সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে ভালবাসা ও ভক্তির অভাব হইলে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। আমাদের সাংসারিক পিতামাতার প্রিয় হইতে গেলে যেমন তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসিতে হয় ও তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্য স্বচ্ছন্দভাবে সাধিত হয়, সেইরূপ আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বরকে ভক্তির সহিত ভালবাসা চাই। উভয়ের সহযোগে আমাদের কর্ত্তব্য-সাধন সহজ হইয়া পড়ে। এই ভক্তি ও প্রেম হৃদয়ে না থাকিলে কোন কাজেই বল পাওয়া যায় না। ইহাদের প্রভাবে সকল কর্ম্ম সিদ্ধিলাভ করে। যখন আমরা নিজের শরীরটিকে খুব হৃষ্ট পুষ্ট করিতে চাই, যাহাতে সুন্দর থাকে তাহার চেষ্টা দেখি, তখন যদি পরমপিতা পরমেশ্বরকে ভালবাসি, ভক্তি করিতে চাই, কেনই বা তাঁহার আবাসস্থান আমাদের এই আত্মাকে তাঁহার জন্য পবিত্র করিতে চেষ্টা না করিব। বিশুদ্ধভাবে নির্ম্মল অন্তঃকরণে একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে আমাদের আত্মা সুন্দরও পবিত্র হইবে, এবং স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় তাঁর প্রেম মূর্ত্তি আমাদের হৃদয় সরোবরে দেখা যাইবে। আমরা সকলে সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান। তাঁহাকে ভালবাসিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার সকল প্রাণীর উপর কর্ত্তব্য পালন, সকল জীবের উপর সদ্ব্যবহার করিয়া সকলের সঙ্গে সদ্ভাবে যাহাতে চলিয়া যাইতে পারি, সেইরূপ উচ্চ শিক্ষা সেইরূপ উচ্চ জ্ঞান শুভবুদ্ধি ও শুভমতি তিনি অন্তরে প্রেরণ করুন। পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। বারংবার তাঁহার চরণে আমরা প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সত্যং।

এ বিশ্ব রচনা নহেক কল্পনা
সত্যের সাধনা এ যে সমুদয়।
বিচিত্র বরণে স্বাদে গন্ধে গানে
প্রকাশিত সত্য এ জগতময়।
সত্যে স্থিতি বিনা জ্ঞান মন প্রাণ,
ফেরে কেন্দ্র-ভ্রষ্ট গ্রহের সমান,
শূন্য পথে তারা হয় দিশাহারা
না পেয়ে কিনারা ভেবে সারা হয়।
সত্যেরে লভিলে ইহারা সকলে,
হিল্লোলিত হয়ে প্রেমের হিল্লোলে,
বাজাইয়া তোলে বিশ্ব ছন্দ তালে
আনন্দ মুরতি ধরে প্রভাময়।
সে আনন্দ রূপ উজ্জল বরণ,
উদ্ভাসিত করি জ্ঞান প্রাণ মন,
নেহারে তখন অন্তরে আপন
যোগাসনে সত্য সমাসীন রয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

প্রার্থনা।

বর্ষশেষ।

বর্ষ কেটে গেল
অনন্তে বুদ্বুদ এক ক্ষণিকে মিশাল।
সব সুখ, সব দুঃখ, পরীক্ষার মাঝে
শুধু বিশ্বরাজ ছবি হৃদয়ে বিরাজে।
তাঁহার করুণা স্মরি, তাঁর করুণায়
কি মধুর শান্তি সুধা লভেছি হিয়ায়।
পেয়েছি নূতন জন্ম যেন ধরা পরে
ভাসিতেছি দিবা নিশি আনন্দ সাগরে।
আসে দুঃখ ভরে চোক নয়নের জলে,
কিন্তু এ [illegible] র আর তাহে নাহি টলে।

দুঃখ মাঝে পাই কার অমৃত পরশ,
কাহার স্নেহের দৃষ্টি সজীব সরস
করিছে এ হিয়া মোর, সংসারে থাকিয়া
তাঁরি কাছে প্রণত এ ক্ষুদ্র মোর হিয়া।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

নববর্ষে।

পুরাতন বর্ষ গত, নবীন বরষে
জাগিয়া উঠুক প্রাণ নবীন হরষে,
গেছে দুঃখ ব্যথা ভয়
শোক নিরানন্দময়
জাগিল নবীন আশা কাহার পরশে ?

কৃতজ্ঞতা ভরে পূর্ণ হৃদয় আমার
কার এই স্নেহ প্রেম এই দান কার ?
যেই স্নেহ প্রেম দিয়া
আজি পুলকিত হিয়া
সে চরণে প্রণিপাত করি বারবার।

এসেছে নবীন বর্ষ নব শক্তি দিয়া,
করহ সজীব নব এই দীন হিয়া।
নব শক্তি লভি প্রাণ
গাহি তব জয় গান
দুঃখ, তাপ, মোহ, পাপ যাব পাশরিয়া।
সর্ব্বস্ব আমার সঁপি দিনু ও-চরণে,
দয়াময় কৃপাদৃষ্টি রেখ সর্ব্বক্ষণে।
তব পুণ্য আশীর্ব্বাদ
ঘিরে থাক সাথে সাথ
চরণে আশ্রয় দিও এ ভিখারী জনে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নানাকথা।

উৎসব।—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে "আমি বিগত ২৯ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের একোনপঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য তৎপূর্ব্ব শনিবার বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺ যোগেশচন্দ্র সরকারের বাটীতে প্রতি বৎসর এই দিন সন্ধ্যার পরে উপাসনা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন বলিলেন যে যোগেশ বাবুর পুত্রেরা তাঁহাদের বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা হইবে না বলিয়া প্রথমে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য প্রাতে তাঁহারা ব্রহ্ম কৃপাবলে উদ্বোধিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে সন্ধ্যা সময়ে তাঁহাদের বাটীতে উপাসনা হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য সমুদায় দানের টাকা দিবেন। আমরা একটু বিশ্রামান্তে তথায় উপাসনা করিতে গেলাম। দেখি সেই গৃহ-কানন উৎসাহ পূর্ণ। বেদীর উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ খানি স্থাপিত। আমি উপাসনা করিলাম এবং রাধকুমার বাবু মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিলেন। উপাসনা শেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ খানি হস্তে লইয়া সেই যুবার হস্তে দিলাম এবং বলিলাম এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ তোমার পিতামহ পরমব্রহ্মভক্ত অম্বিকা বাবুর, ইহা তুমি গ্রহণ কর, ব্রাহ্মধর্ম্মে জীবন বিসর্জ্জন দাও, ব্রহ্মকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া এখানে তাঁহার নিত্য উপাসনা প্রতিষ্ঠিত কর। তিনি সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম মস্তকে ধারণ করিলেন।

রবিবার সমস্ত দিবসব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনান্তে অহৈতুকী "প্রেম" সম্বন্ধে এবং রাত্রে "তপস্যার কষ্ঠব" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ভিক্ষুককে চাউল ও বস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে সম্পাদক বাবু বিনোদ বিহারী সেন মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা শেষ করিয়া বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করি।" ঐ উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

প্রাপ্তিস্বীকার—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। বারান্তরে ইহার সমালোচনা করিব। মূল্য ৸৹ বার আনা। যাঁহারা বৈশাখ মাসের মধ্যে লইবেন, তাঁহাদিগকে আট আনায় দেওয়া যাইবে। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্ আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে উহা প্রাপ্তব্য।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

রাঁচির গিরি-গৃহে ব্রহ্মোৎসব।

ছোটনাগপুর প্রদেশের অন্তঃপাতী রাঁচি নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তাহার একটির নাম মোরাবাদী। মোরাবাদী নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই পর্ব্বতের নিম্নে দূরে দূরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গুলি আছে তাহার অধিকাংশই মুণ্ডা, উরাঁও সম্প্রদায়ের কোল ও হিন্দু আহির প্রভৃতি অতি অজ্ঞ ও সরল লোকের বাসস্থান। ইহারা গো, শূকর ও কুক্কুট পালন করিয়া থাকে। সূর্য্যদেবই ইহাদের উপাস্য। ইহারা গো-গৃহে সূর্য্যের উদ্দেশে শূকর ও কুক্কুট বলি দিয়া থাকে। তাহার মাংসও ইহারা ভোজন করে। এস্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এই গ্রীষ্ম-কালের দুই এক মাস এখানে রৌদ্র উগ্র ও বায়ু প্রচণ্ড হইলেও তাহা স্বাস্থ্যের হানিকর নহে। এখানকার কূপোদক সুমিষ্ট ও শীতল। এ জল পান করিয়া "অপ্সু ভেষজং" এই বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারা যায়।

কর্ম্ম-শেষ জীবনে জন-কোলাহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি লাভের ইচ্ছায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথিতযশঃ দ্বিতীয় ও পঞ্চম পুত্র ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্ব্বত-খণ্ডকেই আপনাদের বাসোপযোগী স্থির করিয়া এখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পর্ব্বতের শিরোদেশে মহেশের মুক্ত মহিমার মধ্যে দেব-মন্দির। তন্নিম্নে পর্ব্বত-গাত্রে ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্জ্জন নিকেতন এবং ইহার সানুপ্রদেশে আশ্রম-মাতা ও বালকগণের আবাসস্থান। এই স্থানে আগমন করিলে প্রথমেই সানুপ্রদেশের আশ্রমটিকে একটি প্রস্ফুটিত আরণ্য-পুষ্পের ন্যায় বোধ হয়। ইহার গঠন প্রণালী এমন নূতন ও শোভা-সম্পন্ন যে দেখিলেই নয়ন মন মুগ্ধ হয়। পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যখন দেখি, তখন নিভৃত-নিকেতনের আর এক ভাব মনে উদয় হয়। ইহার গবাক্ষ দ্বারগুলি যেন দূরান্তবিশিষ্ট আকাশকে আলিঙ্গন করিয়া প্রান্তরস্থিত চতুর্দ্দিকের ক্ষুদ্র শ্যামল তরুগুলিকে স্নেহ-চুম্বনে হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহ ঢালিয়া দিতেছে। এখানকার প্রকৃতি ও প্রজা সকলেই যেন আপনার, কেহ পর

নহে। সরল প্রীতির ইহাই মহিমা। এখানে কোন কোলাহল নাই, কেবলই শান্তি। শান্তিদেবী যেন ইহার নিবাসী-দিগকে সমাধিসুপ্ত করিবার জন্য অহরহ চামর ব্যজন করিতেছেন। উর্দ্ধে শিখরে দিগ্মুক্ত দেবমন্দির সেই শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা বক্ষে ও তাঁহার ওঙ্কারাঙ্কিত মহা-নাম মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রভাতে যখন সূর্য্য রক্তিম বর্ণে প্রকাশিত হয়, তখন ইহারা পূর্ব্বমুখী হইয়া এবং প্রদোষে সূর্য্যের অস্ত-গমন কালে তদভিমুখে ঈশ্বরের আরতি, অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া থাকেন। স্বামী অচ্যুতানন্দ মিশ্র শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়া এই মন্দিরের আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্য ১৮৩২ শকের ৪ঠা বৈশাখ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন। নগর হইতে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও সাকারবাদী হিন্দু সমাজের প্রায় ৮০ জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রভাতে সমবেত সকলে প্রথমে শিখরস্থ মন্দিরে ঈশ্বরের অর্চ্চনা ও আরতি করিয়া স্তুতিগান করিতে করিতে অবরোহণ ও আশ্রমস্থ বৃহৎ মণ্ডপে আসন গ্রহণ করিলেন। এই স্থানেই উপাসনা ও মহেশ্বরের মহৎ যশ ঘোষিত হইল। ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতার আদিসমাজ হইতে সমাগত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও স্বামী অচ্যুতানন্দ মিশ্র অর্চ্চনা পূর্ব্বক বেদী গ্রহণ করিলেন।

"অশ্বইব রোমানি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকং অভিসম্ভবামি"

এই শ্রুতি অবলম্বনে শাস্ত্রী মহাশয় সময়োপযোগী উদ্বোধন করিলে পর উপাসনা ও প্রার্থনা হইয়া সঙ্গীত হইল। তদনন্তর ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা কল্লে একটি হৃদ্য মনোহর বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আর্য্য-সমাজের ভক্তেরা হিন্দি ভজন ও অন্যেরা হরি সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সকলের চিত্ত হরণ করিলে পর প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইল। ইহার পর ফলাহার। বিদূষী ঠাকুর পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অতিথির সৎকারে বড় যশস্বিনী। ইঁহার সহিত মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী অতিথি সৎকারে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে বহুবিধ উপাদেয় ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া সযত্নে সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মের এমনিই মহিমা যে অদ্য তাঁহারই অতুলনীয় প্রেমে সকলে এক প্রাণ হইয়া স্বস্ব গণ্ডী-রেখা ছিন্ন করিয়াছিলেন। দৃশ্য বড় মধুময় অমৃতময় হইয়াছিল।

এখানে চারিটি ভাব দৃশ্যমান। প্রথম, আশ্রমভাব। ইহাতে আশ্রম মাতার আতিথ্য ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, আশ্রম-শিশুর ক্রীড়া-কৌতুক, এবং ধ্যান ও জ্ঞানরত আশ্রমবাসীর নীরব নিশ্চিন্ত ভাবে কাল যাপন। দ্বিতীয়, প্রাতঃপ্রদোষে দেবমন্দিরে মহেশ্বরের আরতি ও বন্দনা। তৃতীয়, মন্দিরের অনতি দূরে যে তিনটি গুহা আছে তাহা যোগীর যোগ সাধনার জন্য অহরহ উন্মুক্ত এবং বজ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝা হইতে আত্মরক্ষণের পরম অনুকূল। চতুর্থ ভাব, লতামণ্ডপ। পর্ব্বতের উত্তর কটিদেশে সুগন্ধী পুষ্পমাতা একটি আরণ্য লতিকা পাষাণ গাত্রে অনাশ্রিত ভাবে লম্বিত ছিল। তাহাকেই আশ্রয় দিবার জন্য এই লতামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং